নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY.
Agartala.

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক : শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়
রাইটার্স সিণ্ডিকেট
প্রাইভেট লিমিটেড
৮৭ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

মুদ্রক : শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্না প্রেস লিমিটেড
৮/১ লালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট : শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

মূল্য : এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

বই পড়ার আগে

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, আমরা যখন দশ বারো বছরের ছেলে, তখন আমাদের সামনে পৃথিবীর যে-চেহারা ছিল··· আজ তোমরা যারা কিশোর-কিশোরী, তোমাদের সামনে পৃথিবীর সে-চেহারা আর নেই, তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ নতুন আর এক পৃথিবী।

গত চল্লিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর চেহারা একদম বদলে গিয়েছে।

আমরা দেখেছিলাম এক পুরাণো পৃথিবীকে······

একশো বছরের এক বুড়ো, বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গিয়েছে, চামড়া ঝুলে পড়েছে, সর্দ্দি-কাশি-ঠাণ্ডার ভয়ে দরজা জানলার ফাঁক এঁটে বন্ধ করে পুরাণো মখমলের ফরাসে বসে রূপোয় বাঁধা হুঁকোতে আতর-মেশানো অম্বুরী তামাক খাচ্ছে···চোখে দেখতে পায় না, তাই পায়ের শব্দ শুনলেই হুঁকো টানার ফাঁকে ফাঁকে আওয়াজ দিয়ে উঠছে, কে যায় রে? সাড়া দিস্ না কেন? কে যায়?

আজ তোমরা দেখছো এক নতুন পৃথিবীকে······

একুশ বছরের এক তরুণ, পা-ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত পেশী নেচে উঠছে, রাত্তিরের অন্ধকারকে দুপায়ে দ'লে রক্ত-রাঙা প্রভাত রবির মত ভ্রূক্ষেপহীন সে চলেছে সারা আকাশ মাড়িয়ে··· ঝড়ো হাওয়ায় যেমন খসে খসে পড়ে পুরাণো বাড়ীর চূণ-সুরকীর

ধূলো তেমনি তার পদক্ষেপে খসে খসে পড়ছে পুরাণো পৃথিবীর নোনা-ধরা সব ইট-কাট······সে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, চলার আবেগে সে নির্মম······তাই আকাশের তলায় আলাস্কা থেকে আসাম পর্য্যন্ত জেগে উঠছে নতুন মানুষ, নতুন মন······

আমরা যে-পৃথিবীতে মানুষ হয়েছি, সে-পৃথিবীতে বীর বলতো তাদের, যারা যুদ্ধ করে, যারা সেনাপতি, যারা রাজা, এক রাজ্য ভেঙ্গে আর-এক রাজ্য গড়ে, এক রাজ-বংশ উচ্ছেদ করে নতুন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করে, আজও স্কুল আর কলেজের ছেলেরা মানুষের যে-ইতিহাস পড়ে, সে-ইতিহাস হলো চোদ্দ আনা সেই রাজা-রাজড়া আর সেনাপতিদের ইতিহাস, এক রাজ-বংশের পর আর এক রাজবংশের ইতিহাস, এক যুদ্ধের পর আর এক যুদ্ধের ইতিহাস···আজও কাণে এসে বাজে স্কুলে ইতিহাসের শিক্ষকের সেই অমূল্য উপদেশ, ইম্‌পর্টেণ্ট যুদ্ধগুলো সব আন্‌ডার লাইন ক'রে পড়বে······

তোমরা যে-পৃথিবীতে বড় হচ্ছো, সে-পৃথিবী বীর ব'লে তাকেই শ্রদ্ধা করে, যে-বৈজ্ঞানিক মানুষের কল্যাণে নিজের দেহে বিষ-প্রয়োগ ক'রে গবেষণা করে, যে-মানুষ মানুষের অজ্ঞানতা দূর করবার জন্যে বিনা-পুরস্কারে নিরুদ্দেশ মৃত্যুর পথে যাত্রা করে, একটা ধানের শীষে এক মুঠো চালের বদলে কি করে দু মুঠো চাল জন্মাতে পারে তারি গবেষণায় যে-মানুষ সারা জীবন কাটিয়ে দিল বন্ধ ঘরে···নিপীড়ন আর নির্য্যাতন আর নিদারুণ অভাবের ভেতর বসে যে-কবি মাত্র ছ'সাতটী শব্দে একটী অমর কবিতার লাইন সৃষ্টি করে গেলেন···আজকের মানুষ বলে, সভ্য মানুষের

ইতিহাসে তাঁদের বীরত্ব শত চেঙ্গিস্, শত নাদির, শত হানিবলের চেয়ে বেশী।

এই যে নতুন পৃথিবীর কথা বলছি, সেই নতুন পৃথিবী এই মহাসত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এই নতুন বীরত্বকে মানুষ জীবনে যতখানি সত্য বলে স্বীকার করবে, তার সভ্যতার মর্য্যাদা ততখানি বাড়বে।

তোমরা সেই নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ। এই নতুন বীরত্বকে তোমাদের বুঝতে হবে, জানতে হবে, জীবনে সত্য করে তুলতে হবে।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই এ্যাডভেঞ্চার সিরিজ তোমাদের জন্য প্রকাশ করছি। হয়ত এর কোন কোন গল্প তোমরা আগে পড়েছো কিন্তু আজ নতুন দৃষ্টি নিয়ে এই সব কাহিনীগুলোকে নতুন করে তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এই নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী হলো আসল জিনিস। তোমাদের সামনে যে মহৎ জীবন পড়ে রয়েছে, কোথায় তার মহত্ব, কোথায় তার বিশেষত্ব, ছেলেবেলা থেকেই বারবার সেই দিকে দৃষ্টিকে ফেরাতে হবে।

একটা গল্প বলি এই সম্পর্কে। প্রাচীন জগতে রোম আর কার্থেজে এক সময় তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। রোমের তখন প্রচণ্ড শক্তি, কার্থেজ কিছুতেই পেরে ওঠে না। বারবার রোমের কাছে পরাজিত হয়ে যায়। কার্থেজের প্রধান নায়ক ছিলেন হ্যানিবলের বাবা। তিনি বুঝলেন, তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত কার্থেজ রোমের পায়ে লুটিয়ে পড়বে। রোমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে কার্থেজের আর

কোন সেনাপতি সাহস করবে না। হ্যানিবল তখন শিশু। তিনি ঠিক করলেন এই শিশুকেই তিনি তৈরী করে যাবেন, এমন করে তৈরী করে যাবেন যাতে রোমের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ আজীবন জেগে থাকে। তাই তিনি প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যায় শিশু হ্যানিবলকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের মন্দিরে যেতেন। সেখানে মন্দিরের দেবতার সামনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আর প্রভাতে শিশুকে মন্ত্র পড়াতেন, মন্ত্র হলো, রোম আমাদের শত্রু, চিরশত্রু। রোমের ধ্বংসই আমার ধর্ম্ম।

পিতার মুখের দিকে চেয়ে শিশু দিনের পর দিন সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতো, এইভাবে পিতার মুখ থেকে সেই একই কথা বারবার শুনতে শুনতে শিশুকাল থেকেই হ্যানিবল রোমকে চিরশত্রুরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর সারাজীবনের নিয়ামক হয়ে গেল।

মন্ত্রটা তফাৎ, কিন্তু পদ্ধতি সেই এক। শিশুকাল থেকেই তোমাদের ধরিয়ে দিতে হবে সেই আদর্শ, যে-আদর্শের ওপর গড়ে উঠছে আজকের নতুন পৃথিবী।

বারবার করে তোমাদের কাণে জপতে হবে নতুন মানুষের মন্ত্র, নতুন বীর্য্যের মন্ত্র।

সেই জন্য এই সিরিজের প্রথম বই হলো এমন একজনের এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী নিয়ে, যাঁর জীবনে আজকের যুগের নতুন মানুষের অনেকগুলো প্রধান বিশেষত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

সেই বিশেষত্বগুলো কি?

আজকের যুগের নতুন মানুষ বিশ্বাস করে, মানুষের জীবনটা যদি একটা খেলা হয়, তাহলে খেলায় হার বা জিত লক্ষ্য নয়, আসল লক্ষ্য হলো, কিভাবে খেলাটা হলো। তাই, খেলায় জেতাটা তার উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেশ্য হলো নিখুঁতভাবে খেলে যাওয়া। যদি তাতে জয় আসে, হাত-পা ছুঁড়ে আনন্দে চীৎকার করবার কিছু নেই, যদি পরাজয় আসে, মুখ-ভার করে বিমর্ষ হয়ে ঝগড়া করবারও কিছু নেই। খেলতে যে নেমেছে, তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা হলো, খেলার নিয়ম মেনে চলা।

জীবনটা যদি একটা রেস্‌ই হয়, তাহলে সব চেয়ে দ্রুত দৌড়ে কে প্রথমে এলো, সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা নয়……রেস্ যখন হয়েছে, তখন একজন প্রথম হবেই, আসল গৌরব হলো তার যে রেসে দৌড়তে নেমে, পা মুছকে পড়ে গিয়েও, রেস থেকে সরে দাঁড়ায় নি, সেই ভাঙ্গা পা নিয়েই যে রেসের শেষ পর্য্যন্ত চলে এসেছে…আজকের নতুন পৃথিবী চায় তাকেই।

জীবনটা যদি একটা যুদ্ধই হয়, তবে সে-যুদ্ধের জয়মাল্য শুধু বলশালী জয়ীর জন্যেই নয়…আজকের নতুন পৃথিবী চায় সেই যোদ্ধাকে, হেরে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত যে যুজেছিল, হেরে গিয়েছিল বলে হাতিয়ারের যে নিন্দা করে নি, জয়ীকে ছোট করে নি, নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয় নি……

মানুষের মনের এত বড় শক্তি আছে যে, সব বিপদ, সব বাধা, সব পরাজয়ের ভেতর থেকেই সে নিজের মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে……

নতুন পৃথিবী ডাকছে সেই মানুষকে, মানুষের মনের নব-দিগন্ত যে নতুন করে আবার আবিষ্কার করবে······

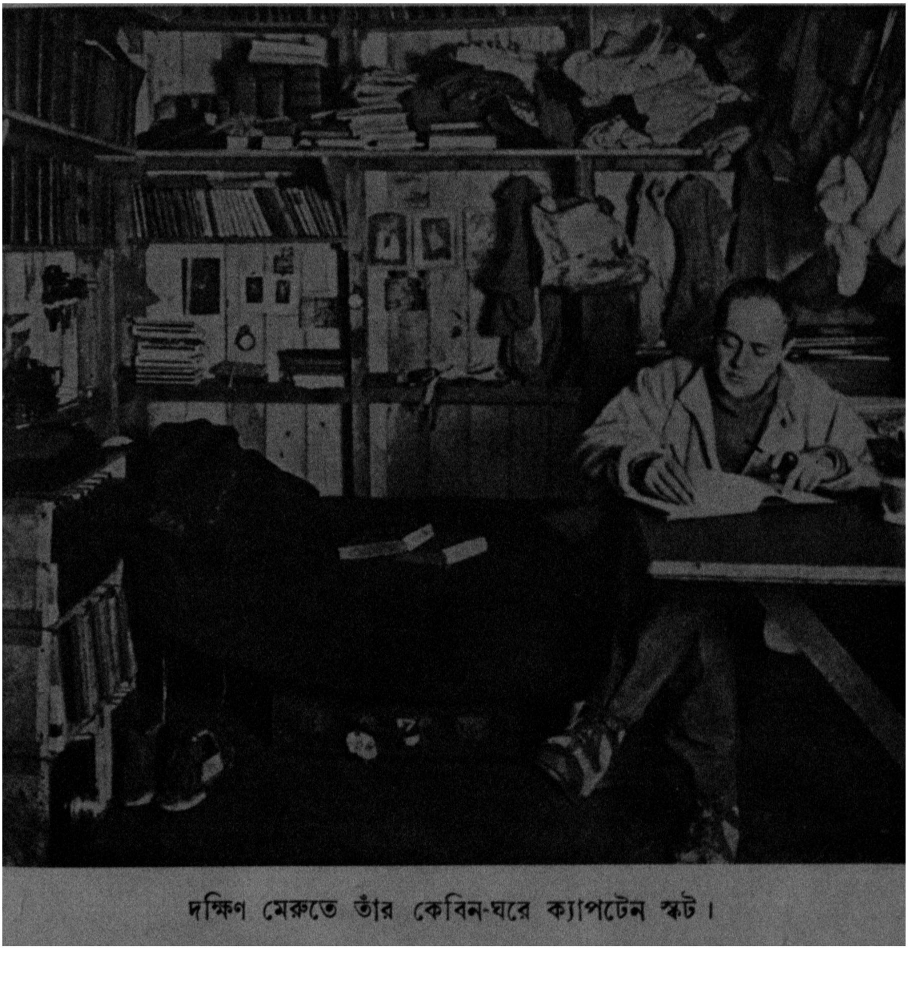
নতুন পৃথিবী বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষই পারে মানুষের মহিমার সীমানাকে বাড়াতে।

মাঠে যে ধান কাটছে, রাস্তায় যে মোট বইছে, কারখানায় যে লোহা পিটছে, রাত জেগে যে লিখছে, চেয়ারে বসে যে শাসন করছে, নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষের মহিমা তাদের প্রত্যেকের ওপরই নির্ভর করছে······

তোমাদের সামনে জাগছে সেই নতুন মানুষের নতুন পৃথিবী······কাণ পেতে শোন, পৃথিবী চারদিক থেকে নাম ধরে তোমাকেই ডাকছে।

সে-ডাক যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



দক্ষিণ মেরুতে তাঁর কেবিন-ঘরে ক্যাপটেন স্কট।

মেরুর ডাক

উনিশ শ' চার সালে স্কট তাঁর দলবল নিয়ে "ডিস্‌কভারী" জাহাজে দক্ষিণ-মেরু অঞ্চল থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে ফিরে এলেন।

দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে গবেষণা করার জন্যে ইংলণ্ডের রাজ-সরকার এই বৈজ্ঞানিক অভিযানকে পাঠান। এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতা নির্বাচিত হন, ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের একজন তরুণ অফিসর, রবার্ট ফ্যালকন্ স্কট।

তিন বছর সেই চির-তুহিন দেশে বাস ক'রে স্কট আর তাঁর বৈজ্ঞানিকের দল ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। বহু বিষয়ে তাঁরা গবেষণা করেছিলেন, সেখানকার আবহাওয়া, মেরু-সমুদ্রের তরঙ্গের গতি-বিধি, জীব-জন্তু, কিভাবে সেই তুষার মহাদেশের ভূমি গড়ে উঠেছে, ভাসমান সব বরফের পাহাড়ের গতিবিধি, তিন বছর ধরে দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে তাঁবু ফেলে বাস ক'রে তাঁরা বহু দরকারী তথ্য নিয়ে ফিরলেন। কিন্তু দক্ষিণ-মেরু-মহাদেশের ভেতর তাঁরা বেশীদূর এগুতে পারলেন না।

এই অভিযানের আগে যাঁরা দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে এসেছিলেন, তাঁরাও কেউ দক্ষিণ-মেরুর ভেতরে এগোতে পারেন নি, অনেকে দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার পথ খুঁজতে বেরিয়ে প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু কেউই সেই নিষ্করুণ অজানা মহাদেশের রহস্য ভেদ করতে পারেন নি, তার প্রবেশ-দ্বার থেকেই মৃত্যুবিতাড়িত হয়ে তাঁদের ফিরতে হয়েছে।

দক্ষিণ-মেরু মহাদেশের যেখানে আরম্ভ সেখানে পৌছতেই মানুষকে দুটী মারাত্মক বাধার সামনে পড়তে হয়। প্রথম হলো, সমুদ্রে

আইস্‌বার্গের বাধা। গরম জলের স্রোত ছাড়িয়ে জাহাজ যতই মেরু-অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যায়, ততই সমুদ্রের চেহারা বদলাতে থাকে। প্রথম প্রথম ছোট ছোট সব বরফের চাঁই চারদিক থেকে ভেসে আসতে থাকে, তারপর আরো দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেই দেখা যায়, সমুদ্র-পথ রোধ করে বিরাট অতিকায় দৈত্যের মতন ভেসে বেড়াচ্ছে কিম্বা দাঁড়িয়ে আছে আইস্‌বার্গের পাহাড়। সমুদ্রের জলও সেখানে জমে বরফ হয়ে আসছে, দুই জমানো বরফের চাঁই-এর মাঝখানে সরু খানিকটা জলের স্রোত বইছে, সেই ক্ষীণ জলস্রোত হলো জাহাজ বা বোট যাবার একমাত্র রাস্তা। সামান্য ভুলে জাহাজ এই জলস্রোতে বন্দী হয়ে যেতে পারে। চারদিক থেকে আইস্‌বার্গ এসে তাকে ঘিরে ফেলে। অনেক সময় এই সব বিরাট আইস্‌বার্গের ধাক্কায় জাহাজ উল্‌টে যায়। যতক্ষণ না সেই সব আইস্‌বার্গ গলে সরে যায়, ততক্ষণ সেইখানে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। এইসব প্রচণ্ড বাধা এড়িয়ে জাহাজ এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে, যেখানে সমুদ্রের পথের শেষ, দক্ষিণ-মেরুর তট-ভূমির যেখান থেকে আরম্ভ, এইখানে পাঁচ শ' মাইল দীর্ঘ চিরস্থির, অচল অটল দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বরফের প্রাচীর, যেন প্রকৃতি এই দুর্লঙ্ঘ্য বরফের বিরাট পাঁচিল তুলে রেখে মানুষকে দক্ষিণ-মেরুতে প্রবেশ করতে নিষেধ করছে। এই বিরাট তুষার-প্রাচীরের নাম হলো, The Great Ice-Barrier.

এই তুষার-প্রাচীরের ওপারে হাজার হাজার মাইল জুড়ে পড়ে রয়েছে চিরস্তব্ধ চিরশুভ্র দক্ষিণ-মেরুর দেশ, যেখানে সেদিনও পড়ে নি একটী মানুষেরও পায়ের চিহ্ন, যেখানে অনাদিকাল থেকে মেরু-সূর্য্যের

স্তিমিত আলোয় চিরকুমারীর মত ধরণী তুষার-বসনে ধ্যান-মৌন হয়ে বসে আছে, প্রথম মানুষের পদ-ধ্বনির আশায়।

কে সে মানুষ যার পদশব্দে ভাঙবে এই অনাদিকালের নিস্তব্ধতা? দক্ষিণ-মেরুর বুকে দাঁড়িয়ে কোন্ সে মানুষ প্রথম বলবে, আমি এসেছি!

* * * *

"ডিস্কভারী" জাহাজে ইংলণ্ডের রাজ-সরকার যে অভিযান পাঠিয়েছিলেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মেরু-অঞ্চলের আবহাওয়া এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার কোন পরিকল্পনাই এই অভিযানের ছিল না। তবুও স্কট চেষ্টা করেছিলেন, গ্রেট আইস্ ব্যারিয়ার পেরিয়ে যতদূর সম্ভব ভেতরে যেতে। তখনও পর্য্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল না যে এই দুর্লঙ্ঘ্য তুষার-প্রাচীর পেরিয়ে ভেতরে বেশীদূর যাওয়া সম্ভব নয়।

স্কট দুজন সঙ্গীকে নিয়ে, ডঃ উইলসন্ আর স্যাকল্টন, তুষার-প্রাচীর থেকে ভেতর দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তিন মাসের মত খাদ্য। কুকুরে-টানা শ্লেজের ওপর নির্ভর করে স্কট এই সম্পূর্ণ অজানা পথে বেরুলেন। তিনজন মানুষ ছাড়া, এগারোটী কুকুর ছিল এই অভিযানের সঙ্গী।

মেরু-অভিযানের নিয়ম হলো, তাঁবু ফেলে ফেলে অগ্রসর হওয়া। প্রথম দিন পঁচিশ মাইল হাঁটার পর অবসন্ন হয়ে তাঁরা যেখানে থামলেন, সেখানে তাঁরা প্রথম তাঁবু ফেলে রাত কাটালেন। পরের দিন সেই তাঁবু থেকে তাঁরা আবার যাত্রা করবেন। কিন্তু তাঁবুটা তাঁরা তুলে নিলেন না, তাঁবু ফেলাই রইলো, এবং তাঁবুর ভেতর হিসেব করে ফেরবার

সময়ের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য আর দরকারী জিনিস-পত্র রেখে দিলেন। এতে এগিয়ে চলবার সময় খানিকটা করে ভার কমে, কারণ যতই এগিয়ে যেতে হয় ততই শক্তি কমে আসতে থাকে এবং তখন সামান্য ভারও বইতে পারা যায় না। তা ছাড়া ফেরবার সময় এই সব তাঁবু ধরেই ফিরতে হয়, এই তাঁবুগুলো হলো ফেরবার পথের নিশানা এবং ফেরবার মুখে খাদ্যের একমাত্র ভাণ্ডার। মেরু-অভিযানের নিয়মই হলো, এই ভাবে তাঁবু ফেলে এগিয়ে যাওয়া কারণ মেরু-পথে সব চেয়ে কঠিন কথা হলো, শুধু পৌঁছলেই হবে না, আবার ফিরে আসতে হবে। মেরুর সেই নিষ্করুণ তুষার-মরুভূমির মধ্যে অপেক্ষা করে থাকবার কোন উপায় নেই, তুমি যেখান থেকে যাত্রা করেছ সেইখানে আবার ফিরে আসতেই হবে। তাই মেরু-অভিযানে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় কথা হলো ফিরে আসা। সেই পথহীন তুষারের রাজ্যে পথের কোন নিশানা নেই। পায়ের চিহ্ন সেখানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষার ঝঞ্ঝায় ঢাকা পড়ে যায়। তাই ফেরবার পথে একমাত্র নিশানা হলো, যাবার-সময়ে-ফেলা এই তাঁবুগুলো। দূর থেকে দূরবীণে এই তাঁবু শাদা বরফের বুকে একটা কালো বিন্দুর মত দেখায়। সেই কালো বিন্দুকে লক্ষ্য করেই ফিরতে হয়। বিপদ হয়, তুষার-ঝড়ে যখন এই তাঁবু বরফে ঢাকা পড়ে যায়, তখন দূরবীণে আর কিছুই দেখা যায় না, চারদিকে শুধু একটানা ছেদহীন শুভ্রতা। ফেরবার পথে যদি কোন রকমে এই তাঁবুর নিশানা হারিয়ে যায়, তাহলে সেই তুষার-মেরু-ভূমিতে বাঁচবার আশা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, কারণ পথের পাথেয় এবং আশ্রয় সব সেই তাঁবুতেই। এইখানে হলো মেরু-অভিযানের ভয়ংকরতা।

এই ভাবে তাঁবু ফেলে সেযাত্রা স্কট আর তাঁর দুজন সঙ্গী প্রায় তিন শ' মাইল ভেতরে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এতদূর আর কোন মানুষ এর আগে আসতে পারে নি কিন্তু খাদ্য তাঁদের ফুরিয়ে এলো এবং শ্যাকলটন তুষারের আঘাতে একেবারে অবশ হয়ে পড়লেন। মেরু-অভিযানের আর এক মহাবিপদ হলো, তুষারের আঘাতে দেহের যেকোন জায়গা অবশ হয়ে যেতে পারে, সারা দেহ তাতে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। শ্যাকলটনের তাই হলো। তখন তিনি সঙ্গী না হয়ে, সব চেয়ে বড় বোঝা হয়ে পড়লেন। অবশ্য সঙ্গীকে নিয়েই ফিরতে হবে। তাই তাঁরা ফিরলেন, কিন্তু যাবার সময় যেখানে দিনে পনেরো কি কুড়ি মাইল স্লেজে এগিয়ে গিয়েছেন, ফেরবার সময় পঙ্গু সঙ্গীর বোঝা নিয়ে সেখানে গতি দিনে আট মাইল কি দশ মাইল হয়ে গেল। সঙ্গে হিসেব করা যে খাবার ছিল, তা তাঁবুতে পৌঁছবার আগেই ফুরিয়ে আসতে লাগলো। তার ওপর সব চেয়ে বিপদ ঘটালো, স্লেজ-টানা কুকুরগুলো। মেরু-তুষারে স্লেজই হলো একমাত্র যান, কুকুরেরা যদি কোন কারণে স্লেজ না টানে, তাহলে নিজেদেরই স্লেজ টেনে এগুতে হয়, সে এক ভয়ংকর পরিশ্রমের ব্যাপার।

যাবার সময় সঙ্গে এগারোটা কুকুর ছিল কিন্তু একে একে ন'টা কুকুরই সেই মেরু-তুহিনে রয়ে গেল। তিনটে কুকুর স্লেজ টানতে টানতে নিমেষে তুষারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, মেরুর পথে বহু জায়গায় আলগা তুলোর মতন তুষার জমে থাকে, তার ভেতর পড়লে আর রক্ষে নেই, চোরবালিতে পড়ার মতন নিমেষে সেই আলগা তুষারের তলায় অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়। তিনটী কুকুর সেইভাবে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। চারটী কুকুর তুষার-ঝঞ্ঝার আঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল, তখন

আর তাদের দিয়ে কোন কাজ করা চলে না। পথের সঙ্গীকে তখন মানুষ নিজের হাতেই মেরে ফেলে। এবং সেই নিহত কুকুরের মাংসই হয় জীবিত কুকুরদের খাদ্য। এই ভাবে ফেরবার পথে মাত্র দুটী কুকুর অবশিষ্ট রইলো। কিন্তু তাদেরও রক্ষা করা সম্ভব হলো না। কারণ হাতে-টানা শ্লেজের গতি একেবারে কমে এলো, তিনদিনে যেখানে তাঁবুতে পৌঁছবার কথা—সেখানে দশ দিন লেগে গেল, তবুও তাঁবুতে পৌঁছনো সম্ভব হলো না। সঙ্গে মোটমাট যা খাদ্য ছিল, তা একেবারে কমে এলো, কোন রকমে প্রাণরক্ষা করার মতন খাদ্য পড়ে আছে। সেই একান্ত কম খাদ্যে শরীরও ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। সঙ্গে যে দুটি কুকুর অবশিষ্ট ছিল, তারাও একেবারে অবশ হয়ে এলো। সঙ্গে মরা কুকুরের যে মাংস ছিল, তা-ও ফুরিয়ে গেল। তখন নিজেদের সেই অতি-স্বল্প খাদ্য থেকে কুকুরদের অংশ দিতে হয় কিন্তু তা দিতে গেলে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে হয়। তখন বাধ্য হয়ে স্কটকে হুকুম দিতে হলো, অবশিষ্ট দুটী কুকুরকে মেরে ফেলবার জন্যে। এই ঘটনার উল্লেখ করে স্কট তাঁর বইতে লিখেছেন, "এর চেয়ে বীভৎস আর সকরুণ ঘটনা আর কিছু হতে পারে না কিন্তু মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে মানুষের চিরসঙ্গী এই সব মূক জন্তুদের বলি বিছানো পড়ে রয়েছে। আজও কাণে বাজে. সেই মেরু-নির্জনতার ভেতর নিহত কুকুরদের অন্তিম চীৎকার…" আপনা থেকে এই কঠোর সৈনিকের চোখ জলে ভ'রে আসে।

পঙ্গু শ্যাকলটনকে নিয়ে স্কট আর উইলসন সেযাত্রা কোন রকমে তাঁবুতে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

এইভাবে তিন বছর মেরু-অঞ্চলে বাস করে স্কট তাঁর দলবল নিয়ে

ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। দক্ষিণ-মেরু সম্বন্ধে ইংলণ্ডের খবরের কাগজে দিনকতক খুব আলোচনা হলো। স্কটের এই প্রথম দক্ষিণ-মেরু-অভিযান যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা তার খুব প্রশংসা করলেন। তার পর, মানুষ দক্ষিণ-মেরুকে আবার ভুলে গেল।

স্কট আবার নৌ-বিভাগে তাঁর কাজে যোগদান করলেন এবং ক্যাপটেনের পদে উন্নীত হলেন। নৌ-বিভাগের অফিসর হিসাবে তাঁর খ্যাতি বেড়েই চল্লো। সামনে সৈনিক জীবনের সর্ব্বোচ্চ সম্মান, ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ—বাইরে কোথাও দক্ষিণ-মেরু সম্বন্ধে আর কোন কৌতুহলের প্রকাশ নেই। ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের ক্যাপটেনের জীবন জাহাজে জাহাজে আর সমুদ্র-পথে ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেমন চলে, তেমনি চলতে লাগলো।

কিন্তু সকলের অগোচরে, রাত্রি-নিশীথে হঠাৎ নীল সমুদ্রের বুকে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যেতো···বাইরে জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হতো, সামনে ভেসে আসছে অসংখ্য আইস্‌বার্গের দল···কাণ পেতে শুনতেন, অতি দূর থেকে পেঙ্গুইন-পাখীর ডানার ঝাপটার আওয়াজে আসছে, দক্ষিণ-মেরুর আহ্বান···

নিজের অন্তরে মহানীরবতায় স্কট বুঝলেন, সমুদ্রের যেমন নেশা আছে, শহরের যেমন নেশা আছে, গ্রামের যেমন নেশা আছে, তেমনি নেশা আছে সেই মেরু-নির্জনতার! সেই মৃত্যু-হিম মেরু-নির্জনতা তাঁকে ডাকছে···সে-ডাক তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে···কি করে প্রত্যাখ্যান করবেন তাকে?

ঘরে একমাত্র বন্ধন বৃদ্ধ মাতা,—বন্ধন বটে, আশ্রয়ও বটে। দেবীর মতন ভালবাসেন মাকে।

মা অনুযোগ করে, বিয়ে কর্, বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমি একলা এভাবে কি করে আর থাকি ?

স্কট ভেতর থেকে কেঁপে ওঠেন। যদিও বাইরে কারুর কাছে প্রকাশ করেন নি, কিন্তু মনে মনে তিনি স্থির করে ফেলেছেন, যা আজ পর্য্যন্ত কেউ ভাবতে পারে নি, তিনি তাকে জীবনে সত্য করে তুলবেন, দক্ষিণ-মেরুতে তিনি গিয়ে পৌঁছবেন, তাঁরই প্রথম পদ-ধ্বনিতে ভাঙবে মেরুর অনাদি স্তব্ধতা, ইংলণ্ডের গৌরব একজন ইংরেজই প্রথম করবে এই অসাধ্য সাধন ! কিন্তু এই মেরু-অভিযান মানে তো মৃত্যু-অভিযান ! সেই অনিশ্চিত মৃত্যু-ভরা অজানা পথে কি আছে কে বলতে পারে ? কাল যাকে এই মৃত্যু-অভিযানে বেরুতে হবে, আজ সে কি করে বিয়ে করে ? আর, জেনেশুনে কেই বা বিয়ে করবে এমন লোককে, বিয়ের পর যে চলে যাবে সভ্য মানুষের সীমানা ছাড়িয়ে মহা-অনিশ্চিতের পথে, ফিরবে কি ফিরবে না যার নেই কোন স্থিরতা, এমন কি কোন সংবাদও যার পাওয়া যাবে না বছরের পর বছর !

তাই বিয়ের প্রস্তাবে মায়ের কাছে কোন উত্তর দিতে পারেন না। যত দিন যায়, ততই মনের মধ্যে সংকল্প দৃঢ় হয়ে ওঠে, দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারে তিনি যাবেনই। কিন্তু বাইরে সে-কথা কারুর কাছেই প্রকাশ করেন না। নীরবে নিজেকে প্রস্তুত করেন।

ডিস্‌কভারী জাহাজে যখন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলে গিয়েছিলেন, তখন সেই অভিযানের সমস্ত ভার ও দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টই গ্রহণ করেছিল। তার পর থেকে গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-মেরু সম্পর্কে আর কোন উৎসাহই দেখায়নি। দক্ষিণ মেরুতে পায়ে হেঁটে পৌঁছনো অসম্ভব এবং এই অসম্ভব পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাবার

কোন ইচ্ছাই গভর্ণমেণ্টের ছিল না। ইংলণ্ডের জনসাধারণও দক্ষিণ-মেরু সম্বন্ধে তেমনি উদাসীন। দক্ষিণ মেরুর কথা উঠলেই তখন লোকের মনে জেগে উঠতো নরওয়েবাসী ন্যান্‌সেনের নাম। দক্ষিণ-মেরু-অঞ্চলে ন্যান্‌সেনের অভিযানই তখন সকলে বিস্ময়ে পড়তো, ন্যান্‌সেন শ্লেজে ক'রে গ্রীণল্যাণ্ডের তুষার-প্রান্তর কৃতিত্বের সঙ্গে পার হয়েছিলেন এবং তাঁর অভিযান থেকেই লোকে বুঝতে পারে দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছনো কি দুঃসাধ্য ব্যাপাব, ন্যান্‌সেনও সে-চেষ্টায় ব্যর্থ হন। ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে তখন একটা ধারণা আপনা থেকেই জন্মেছিল, যদি কোন দিন দক্ষিণ-মেরুতে কেউ গিয়ে পৌঁছতে পারে, তা সে ন্যান্‌সেনই।

কিন্তু ইংরেজ নৌ-সৈনিক স্কটের মনে জেগে উঠলো দুর্ব্বার দুরাকাঙ্ক্ষা, ন্যান্‌সেন যদি পারেন, তিনিই বা পারবেন না কেন ?

তবে স্কট একথা বুঝলেন, এ-অভিযানের দায়িত্ব বা খরচ ইংলণ্ডের রাজ-সরকার বহন করবে না, এর সমস্ত ভার ও দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হবে। এবং নিজের অভিজ্ঞতা আর ন্যান্‌সেনের লেখা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, মেরু-অভিযানের সব চেয়ে কঠিন কাজ হলো অভিযানের আয়োজন করা। একটা বিরাট যুদ্ধের আয়োজনের চেয়ে কঠিন কাজ এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

চারিদিকে চেয়ে কোথাও কোন আশার চিহ্ন দেখলেন না। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না। এই উদাসীনতাকে স্বীকার করে নিয়েই আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে হবে। নীরবে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। সবচেয়ে প্রথম কর্ত্তব্য হলো, বৃদ্ধা মার ব্যবস্থা করা, তাঁর অনুপস্থিতিতে মার কাছে একজন কারুর থাকা দরকার,

যে মাকে দেখতে পারবে, যত্ন করতে পারবে। একমাত্র স্ত্রীই তা পারে।

বহুদিন থেকে একটী মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ায়। একদিন তাঁকেই স্কট তাঁর অন্তরের বাসনার কথা জানালেন, জানালেন দক্ষিণ-মেরুতে যাবার জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন!

মেয়েটী মুগ্ধ বিস্ময়ে স্কটের পরিকল্পনার কথা শুনলেন। বল্লেন, আমি হব তোমার সহায়!

স্কট বলেন, কিন্তু বিয়ের পর হয়ত বছর খানেক আয়োজনের জন্যে আমি ইংলণ্ডে থাকবো, তাও সারা ইংলণ্ডে ঘুরে বেড়াতে হবে···তারপর, জানি না কত দিন পরে দক্ষিণ-মেরু থেকে ফিরে আসতে পারবো···

মেয়েটী আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকবো, তুমি জয়ী হয়ে ফিরে এলে, আমিও তো সে-গৌরবের অংশ পাবো!

বিয়ের দিন স্থির হলো।

এক পাশে বৃদ্ধা জননী, আর পাশে সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে বিয়ের পর স্কট যখন গির্জ্জার ভেতর থেকে দরজায় এসে দাঁড়ালেন, হঠাৎ নির্মেঘ আকাশে বজ্র ডেকে উঠলো!

বৃদ্ধা সভয়ে পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন, নব-পরিণীতার মুখ বিবর্ণ হয়ে এলো, হাসতে হাসতে স্কট তাঁদের নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

আয়োজন-পর্ব্ব

পরের বছর, অর্থাৎ উনিশ শ' ন সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, স্কট তাঁর পরিকল্পনার কথা কাগজে প্রকাশ করলেন, শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে নয়, এবার তিনি যাবেন দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারে, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছে সেখানে উড়িয়ে আসবেন ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা।

বড় বড় কাগজের সম্পাদকেরা তাঁর খুব তারিফ করলেন কিন্তু তার বেশী আর কিছু ঘটলো না। ইংলণ্ডের রাজ-সরকারও অর্থ-সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন না, জনসাধারণের মধ্যেও বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা গেল না। স্কট বুঝলেন, এ বিরাট অভিযানের আয়োজনের জন্যে তাঁকে কি পর্ব্বত-পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে, এর জন্যে দরকার প্রত্যেকটী পয়সা তাঁকেই সংগ্রহ করতে হবে। টাকার জোগাড় হবে, তারপর অভিযানের জন্যে জোগাড় করতে হবে, জাহাজ থেকে আরম্ভ করে দেশলাই এর কাটি পর্য্যন্ত হাজার রকম জিনিস।

হাজার রকম যে বল্লাম, এটা কথার কথা নয়, সত্যি মেরু-অভিযানের সব চেয়ে কঠিন কাজ হলো এই আয়োজন-পর্ব্ব। তিন-চার বছরের মতন যা কিছু দরকার সবই আগে থাকতে ভেবে-চিন্তে সংগ্রহ ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কারণ এই তিন-চার বছর মানুষের সভ্যতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না, মেরু-নির্জ্জনতার মধ্যে গিয়ে পড়লে সেখানে লক্ষ টাকা দিলেও একটা দেশলাই-এর কাঠি পাওয়া যাবে না, তাই সব জিনিস হিসেব করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, এবং কতরকমের জিনিস যে লাগতে পারে তার পূরো তালিকা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ইংরাজীতে একটা

ছড়া আছে, সামান্য একটা ঘোড়ার নালের অভাবে, সেনাপতি যুদ্ধে হেরে গেল! একথাটা যে কত বড় সত্যি, মেরু-অভিযানের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায়। শহরের মধ্যে যে জিনিস অতি তুচ্ছ, মেরু-নির্জ্জনতার মধ্যে তার অভাবে সমস্ত অভিযান ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাই অভিযানের যিনি নায়ক, তাঁর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো এই আয়োজন-পর্ব্ব।

এই আয়োজন-পর্ব্ব যে কি বিরাট আর কি কঠিন তার একটু পরিচয় না জানলে মেরু-অভিযানের যথার্থ মূল্য বোঝা সম্ভব নয়। প্রথম হলো, যে-জাহাজে দক্ষিণ মেরুর তট-ভূমি পর্য্যন্ত যাওয়া হবে, সে-জাহাজের গড়ন, আয়তন, কল-কব্জা সমস্ত আলাদা করে গড়তে হবে, কারণ মেরু-সাগরে বরফের চাঁই-এর ভেতর খুব ভারী জাহাজ অচল। সেখানে জাহাজ যদি বিকল হয়ে যায়, তখুনি তখুনি মেরামত করবার সব যন্ত্রপাতি সঙ্গে থাকা দরকার। জাহাজে থাকবে তিন রকমের প্রাণী, মানুষ, কুকুর আর ঘোড়া। জাহাজ থেকে নেমে যখন মেরু-তুষারের ওপর দিয়ে চলতে হবে, তখন মানুষ, কুকুর আর ঘোড়া পরস্পরের সাথী হয়েই থাকবে। তিন রকমের প্রাণী, তিন রকমের খাদ্য এবং তাদের প্রত্যেকের সংখ্যা কম নয়। মেরু-অঞ্চলে খাদ্যের ভেতর যদি ভিটামিনের অভাব ঘটে, তাহলে বিদঘুটে চর্ম্মরোগ দেখা দেয় এবং জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। এই এতগুলি প্রাণীর সব রকম খাদ্য সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদের সংরক্ষণ করতে হবে, কারণ সেই তুষার-মরুভূমিতে এক কণা ঘাসও পাওয়া যাবে না। যে-সে কুকুর বা ঘোড়া নিয়ে গেলেই চলবে না, পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরে তুষার-অঞ্চলে যে কুকুর আর ঘোড়া পাওয়া যায়, সেই সব অঞ্চল থেকে

বেছে বেছে কুকুর আর ঘোড়া সংগ্রহ করতে হবে। তারপর, এই সব প্রাণীর থাকবার জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা, তাঁবুতে শোবার উপকরণ, খাদ্য তৈরী করবার সাজ-সরঞ্জাম, স্পিরিট থেকে আরম্ভ করে দেশালাই-এর কাটিটি পর্যন্ত। এতগুলি প্রাণীকে মেরুর সেই মৃত্যু হিম হাওয়ায় চলতে ফিরতে বাস করতে হবে, যেকোন সময় তাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে পারে, বরফে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে যেতে পারে, তুষার ঝঞ্ঝার আঘাতে হাত-পা অবশ হয়ে যেতে পারে, নানারকমের চর্ম্মরোগ দেখা দিতে পারে, তার জন্য রীতিমত ওষুধ আর চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই হলো একদিকের কথা।

মেরু-অভিযানের আর একটা দিক আছে। সেটা হলো বৈজ্ঞানিক তথ্য-সংগ্রহের দিক। প্রথম ডিস্কভারী অভিযানে পাঁচজন বৈজ্ঞানিক গিয়েছিলেন, স্কটের দ্বিতীয় অভিযানে বারোজন বৈজ্ঞানিক গিয়েছিলেন। এবং এই বারো জন বৈজ্ঞানিকের প্রত্যেকের গবেষণার বিষয় আলাদা এবং প্রত্যেকের গবেষণার যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এবং অন্য সব উপকরণ আলাদা আলাদা, সমস্তই সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এই বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে ছিলেন হার্বার্ট পনটিঙ্, জগতের একজন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান, মেরুর যা কিছু ছবি, তাঁরই জন্যে জগতের লোক প্রথম দেখতে পায়। তাঁর ক্যামেরা আর আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিষ-পত্র তাঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ মেরু অভিযানে বেরুতে হলে এতগুলি মানুষের এতো বিভিন্ন রকমের দরকারের সমস্ত জিনিষ তিন-চার বছরের মতন হিসেব করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এবং এই বিরাট আয়োজনের দায়িত্ব হলো, অভিযানের দলপতির সুতরাং বুঝতে পারছো, মেরু-অভিযানের

দলপতি হতে হলে, পাকা সংসারী লোকের টনটনে হিসেবী বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে মহাবীরের অমিত বীর্য্য পর্য্যন্ত কত রকমের বিশেষগুণের অধিকারী হতে হয়।

এই বিরাট উপকরণ-সংগ্রহের জন্যে প্রথম যে-জিনিস দরকার, তা হলো টাকা। সামান্য টাকা নয়, প্রচুর টাকা, অন্তত কম পক্ষে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড।

স্কট যখন তাঁর পরিকল্পনা প্রথম কাগজে বার করলেন, তখন তিনি রিক্ত অর্থাৎ নৌ-বিভাগে তাঁর মাসিক মাইনে ছাড়া আর এক কপর্দ্দকও তাঁর নেই। এবং মাইনে যা পান, তাতে কোন রকমে তাঁর সংসার খরচ চলে যায়।

সম্পদের মধ্যে, মনে অটল বিশ্বাস।

গভর্ণমেণ্টের কাছে অর্থ-সাহায্যের কোন ইঙ্গিতই পেলেন না। বুঝলেন, এ টাকা তিল তিল করে তাঁকে জাতির কাছ থেকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তুলতে হবে। তার জন্য সারা ইংলণ্ড ঘুরে বেড়াতে হবে। নৌ-বিভাগের কাজ করে তা সম্ভব নয়। তাই তিনি ছ'মাসের ছুটি চাইলেন। ছুটি পেলেন বটে কিন্তু অর্দ্ধেক মাইনেতে। অর্থাৎ সংসারের যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাও বিসর্জ্জন দিতে হবে। স্কট তাতেই রাজী হয়ে ছ'মাসের ছুটি নিলেন।

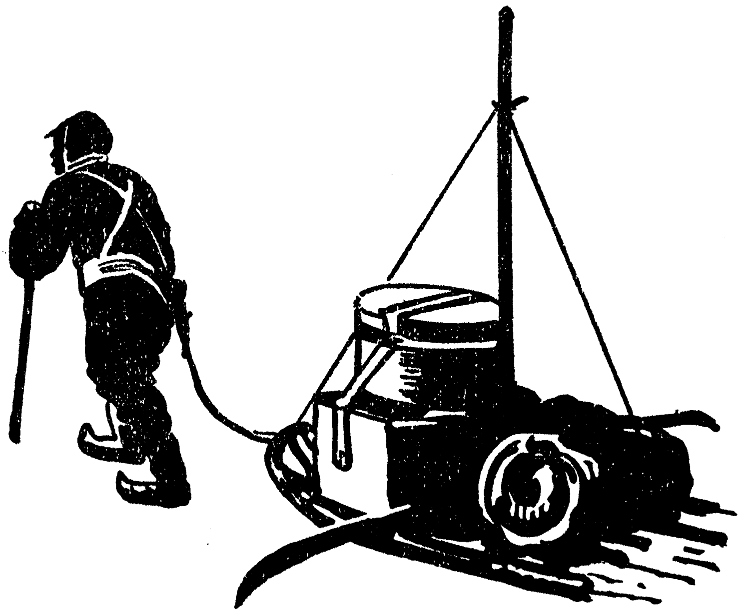
এই ছ'মাস বিরামবিহীন তিনি ইংলণ্ডের শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, বক্তৃতার শেষে প্রত্যেক জায়গায় অর্থ-সাহায্যের জন্যে টুপি পাতেন। এক পাউণ্ড, দু পাউণ্ড করে, ক্রমশ জনতার কাছ থেকে সহানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আসতে থাকে। তাঁর বক্তৃতার ফলে দেশের মধ্যে একটা উৎসাহও ক্রমশঃ জেগে উঠলো। ক্রমশঃ

AJA BIR BIKRAM COL

হুচারজন বড়লোক মোটা অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন, কোন কোন ব্যবসায়ী বিনামূল্যে দরকারী জিনিস-পত্র দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দক্ষিণ মেরু-অভিযান সম্পর্কে স্কটের বক্তৃতার ফলে একটা জাতীয় উৎসাহ জেগে উঠলো এবং অর্থ-সংগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে তোলবার আশায় স্কটও ঘোষণা করলেন, তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ-মেরুতে পৌছানো, যেখানে আজও পর্য্যন্ত কোন মানুষ পৌছতে পারে নি, সেইখানে তিনি নিয়ে যাবেন য়ুনিয়ন জ্যাককে, ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকাকে। স্কটেব এই বক্তৃতা ইংরাজ জাতের অন্তর স্পর্শ করলো। স্বয়ং রাজ-মাতা জানালেন, স্কট দক্ষিণ-মেরুতে যে-পতাকা পুঁতে আসবেন, তিনি নিজের হাতে সে-পতাকা তৈরী করে স্কটকে দেবেন। দেখতে দেখতে স্কট দশহাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করলেন। তখন ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট স্কটের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন এবং বাকি কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত হলেন, তবে এই সর্ত্ত হলো যে, এই অভিযানের নাম স্কটের অভিযানের বদলে জাতীয় দক্ষিণ মেরু-অভিযান হবে। স্কট তাতেই সম্মত হলেন। আয়োজন-পর্ব্বের প্রথম সঙ্কট দূর হয়ে গেল। অভিযান সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রইলো না। এখন দরকার অভিযানের উপকরণ, লোকজন এবং জন্তুদের সংগ্রহ করা।

এই সম্পর্কে একটা কথা তোমরা শুনলে খুশী হবে, স্কট যখন টাকার জন্যে ইংলণ্ডের শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় সব চেয়ে বেশী উৎসাহ তিনি পান, ইংলণ্ডের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। এক পেনী হু পেনী নিজেদের পকেট-খরচের পয়সা থেকে তারা জমিয়ে স্কটের হাতে দেয়। অনেক স্কুল আবার চাঁদা তুলে

অভিযানের দরকারী যা হোক্ একটা জিনিস কিনে স্কটের কাছে উপহার পাঠায়। এই উৎসাহ স্কটের অন্তর স্পর্শ করে। তিনি বুঝলেন, তাঁর জাতির কিশোর-কিশোরীদের মনও তাঁর সঙ্গে এই এ্যাডভেঞ্চারে যোগদান করেছে…একটা সমগ্র জাতির এ্যাডভেঞ্চার-স্পৃহা আর আত্মমর্য্যাদার প্রতীক হয়ে তাঁকে যেতে হবে দক্ষিণ মেরুতে। জয়ী হয়ে তাঁকে ফিরতেই হবে…



আয়োজনের দ্বিতীয় পর্ব্ব

টাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে স্কট এইবার অভিযানের জন্যে উপযুক্ত লোকের নির্বাচনে মন দিলেন। সব শুদ্ধ পঁইষট্টিজন লোক এই অভিযানে যোগদান করেন। কিন্তু এই পঁইষট্টিজনের মধ্যে বত্রিশজন হলেন, জাহাজের লোক। অর্থাৎ তাঁরা জাহাজের কাজেই থাকবেন, তীরে নেমে প্রকৃত অভিযানে তাঁরা যোগ দেবেন না। অভিযানের ভাষায় এঁদের বলা হয়, Ship's Party. এছাড়া স্কট বেছে বেছে নানা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা করবার জন্যে একটা বৈজ্ঞানিক ষ্টাফ সঙ্গে নিলেন। তাদের সংখ্যা হলো বারো জন। এই বারো জনের সহায়ক আরো ১৪ জনকে নিলেন, অভিযানের পরিভাষায় তাঁদের বলা হলো শুধু "Men". তাঁরা অধিকাংশই জাহাজের পেটি অফিসর ও বৈজ্ঞানিকদের সহায়ক। এঁদের সকলের ওপর হলো অফিসর দল, এই অফিসর দলের ওপরই এই অভিযানের সমস্ত দায়িত্ব। সাতজনকে নিয়ে এই অফিসর দল গঠিত হলো, নায়ক স্কট; উপ-নায়ক লেফ্‌টেনাণ্ট ইভান্‌স্‌; ভিক্‌টর এল, এ, ক্যাম্‌বেল; হেনরী আর বোয়ার্স; লরেন্স ই জি ওটস্‌; জি মারে লেভিক এবং এডওয়ার্ড এল্‌ এট্‌কিন্‌সন। এই সাতজনই ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের ক্যাপটেন অথবা লেফ্‌টেনাণ্ট rank-এর বড় অফিসর ছিলেন। শেষের দুজন ছিলেন সার্জন।

বৈজ্ঞানিক ষ্টাফের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন, এডওয়ার্ড উইলসন। ফটোগ্রাফীর ভার দেওয়া হলো হাবার্ট জি পন্‌টিঙের ওপর।

যখন স্কট তাঁর অভিযানের অফিসর-নির্বাচনে ব্যস্ত সেই সময় ভারতবর্ষের Mhow শহর থেকে একটা চিঠি পেলেন, চিঠি লিখছেন সেই শহরে অধিষ্ঠিত এক বৃটিশ-সেনা-বাহিনীর ক্যাপটেন,, লরেন্স ওট্‌স্‌। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, বহুদিন থেকে তাঁর অন্তরের বাসনা, মেরু-অভিযানে যোগদান করার। তাঁর বিশেষ দাবীর মধ্যে তিনি লিখেছেন, সৈনিকের কাজ ছাড়া, ছেলেবেলা থেকে কুকুর আর ঘোড়ার লালন-পালনে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেছেন। এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, যদি তাঁকে এই সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তিনি তাঁর সামান্য সঞ্চয় থেকে বছরে এক হাজার পাউণ্ড করে চাঁদা দিতে পারেন!

স্কট তাঁকে আসবার জন্যে লিখে পাঠালেন। সৈনিক-বিভাগের কাজে ছুটি নিয়ে ওটস্‌ ভারতবর্ষ থেকে ছুটলেন লণ্ডনের পথে। লণ্ডনে পৌঁছেই তিনি স্কটের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। স্কট তখন একমনে কাজ করছিলেন, তিনি ভাবতেই পারেন নি ওট্‌স্‌ এত শিগ্‌গির চলে আসতে পারেন। স্কটের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে ওট্‌স্‌ সৈনিকের ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে বল্লেন, "I am Oates"!

আজ ইংরেজী ভাষায় এই সামান্য তিনটে অক্ষরের যে কি বিরাট তাৎপর্য তা এই কাহিনীর শেষেই বুঝতে পারবে।

ওট্‌সের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় স্কট মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁকে এই অভিযানের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে স্বীকার করলেন কিন্তু একটু খট্‌কা রয়ে গেল। এই অভিযানের সঙ্গী হতে হলে অন্তত সার্ভে বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। তা ওট্‌সের ছিল না। কিন্তু ওট্‌স তাতে দমলেন না, বল্লেন, যদি শেখবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাহলে এই কমাসের মধ্যে আমি দিনরাত খেটে শিখে

নেবো! স্কট সেই ব্যবস্থাই করলেন, ওট্‌স্‌ রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীতে সার্ভের স্পেশাল কোর্সে পড়তে সুরু করে দিলেন।

এই সময় একদিন ওট্‌স্‌ স্কটকে বলেছিলেন, দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছবার জন্যে অবশেষে যে-দল যাত্রা করবে, আমাকে কিন্তু সেই দলে নিতে হবে!

দলের অধিনায়ক হিসাবে স্কট সেদিন বলেছিলেন, আমি ঠিক করেছি, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার শেষ অভিযানে আমরা পাঁচজন থাকবো। বাকি চারজন কে হবে, তা এখন বলতে পারিনা। দলের মধ্যে যে চারজনকে দেখবো সব চেয়ে "fit", সেই চারজনকেই সঙ্গে নেবো!

ওটসের নিয়োগ-পত্রে দেখা যায়, জাহাজে সাধারণভাবে সকল বিভাগকে সাহায্য করবার জন্যে তাঁকে নেওয়া হয় এবং তাঁর বেতন হয়, মাসিক ১ শিলিং!

মানুষের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল, কুকুর আর ঘোড়া সংগ্রহের ব্যাপার। স্কটের দলে বৈজ্ঞানিক ষ্টাফের ভেতর ছিলেন, দুজন অদ্ভুত লোক, একজনের নাম Meares, আর একজনের নাম Bruce দুজনেই ভ্রমণকারী, সারাজীবন ধরে শুধু পৃথিবীর দূর-দূরান্তর প্রদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাছাড়া Meares কুকুর আর ঘোড়া সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। স্কট তাঁরই ওপর ভার দেন, অভিযানের উপযুক্ত কুকুর আর পনি-ঘোড়া সংগ্রহ করবার জন্যে। যে-সে কুকুর বা ঘোড়া হলে চলবে না, দক্ষিণ-মেরুর সেই দুরন্ত শীতে বরফের পথে যে-কুকুর বা যে-ঘোড়া টিকে থেকে পরিশ্রম করতে পারবে, তাদেরই সঙ্গে নিতে হবে। সেই অজানা তুষার-পথে তারাই হবে প্রধান সহায়। সুতরাং মেরু-অঞ্চলে

যে-সব কুকুর আর ঘোড়া অভ্যস্ত, সেই জাতীয় জন্তুই সংগ্রহ করতে হবে। সেই সব জন্তু থাকে, মানুষের সভ্যতা থেকে বহুদূরে তুষার সাইবেরিয়ার দূর দূরান্তর গ্রামে। সেখান থেকে তাদের সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে, নিউজীল্যাণ্ডে! কারণ, নিউজীল্যাণ্ডেই অভিযানের বিভিন্ন দলকে এসে মিলতে হবে এবং সেখান থেকেই অভিযান দক্ষিণ-মেরুর পথে যাত্রা করবে। কি করে মায়ার্স সেই সুদূর উত্তর সাইবেরিয়ার ভেতর থেকে এই সব দুর্দ্দান্ত মেরু-কুকুরদের সংগ্রহ করে নিউজীল্যাণ্ডে এসে পৌছিয়ে ছিলেন, সেইটেই আর এক রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী।

এইখানে তোমাদের একটা কথা জেনে রাখা দরকার। আজ আমরা স্বাধীন হয়ে জগতের সভ্যজাতির সভায় আসন নিয়ে বসতে চলেছি কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির কাছ থেকে আজও আমাদের বহু জিনিস শিখতে বাকি আছে। আজকের যুগ হলো organisation-এর যুগ। যেকোন organisation-কে সার্থক করে তুলতে হলে দরকার নিয়ম নিষ্ঠা, দরকার যেকোন উপায়ে নির্দ্দিষ্ট সময় মত কাজটা সম্পন্ন করা। স্কট মায়ার্সকে বলে দিয়েছিলেন, অমুক তারিখের মধ্যে আমাদেব জাহাজ নিউজীল্যাণ্ডের লিটেলটন বন্দর থেকে ছাড়বে, সেই তারিখের মধ্যে তোমাকে অন্তত উনিশটা সাইবেরিয়ান পনি-ঘোড়া আর চৌত্রিশটা মেরু-কুকুর নিয়ে সেখানে হাজির থাকতে হবে! সেই কাজের ভার নিয়ে মেয়ার্স আর ব্রুস লণ্ডন থেকে সাইবেরিয়া যাত্রা করেন। এবং নানা-রকমের বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে তাঁরা ঠিক সময়মত লিটেলটন বন্দরে তাঁদের জন্তুদের নিয়ে হাজির থাকেন। তার জন্যে তাঁদের যে কি অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রথম তাঁরা Vladivostock-এ এলেন, সেখান থেকে ট্রেনে করে এলেন,

Kharbavovsk, কারণ সেখানে পূর্ব্ব-সাইবেরিয়া অঞ্চলের গভর্ণর জেনারেল উন্‌টারবার্জার থাকেন। উন্‌টারবার্জারের সাহায্য ছাড়া সাইবেরিয়ার আরো ভেতরে যাবার কোন উপায় নেই। আমুর নদী তখন বরফে জমে গিয়েছে, শ্লেজে করে সেই আমুর নদী ধরে ছ'শো মাইল ভেতরে যেতে হবে! সেখানে বরফের দেশে বুনো লোকেরা বাস করে, তারা তাদের শীকারের জন্যে এই সব কুকুর পোষে। এই সাইবেরিয়ান কুকুরেরা নেকড়েরই জাত-ভাই এবং সামনাসামনি যুদ্ধে অনায়াসে নেকড়েদের বধ করে। সেই বুনো লোকদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ বাস ক'রে মায়ার্স নির্বাচিত কুকুরদের নিজের মতন করে "ট্রেন" করে তাদের নিয়ে আবার ফিরলেন সভ্যতার দেশে। ইতিমধ্যে ব্রুস্ এই-ভাবে পনি-ঘোড়া সংগ্রহ করে মায়ার্সের জন্যে Vladivostock-এ অপেক্ষা করছিলেন। সেখান থেকে এই জন্তুদের নিউজীল্যাণ্ডের লিটেলটন বন্দরে নিয়ে আসতে অন্তত চারবার জাহাজ বদল করতে হয়েছে। এই দুঃসাধ্য কাজে মায়ার্স আর ব্রুসকে দুজন লোক খুব সাহায্য করেন, যদিও তাঁরা সইস্-জাতীয় লোক, কিন্তু অভিযানের ইতিহাসে তাঁদেরও নাম অমর হয়ে আছে। একজন হলেন রাশিয়ান, নাম আণ্টন, তিনি ঘোড়াদের দেখাশোনা করতেন—আর একজন হলেন নরওয়েদেশের লোক, ডিমিট্রিক, তিনি কুকুরদের দেখতেন।

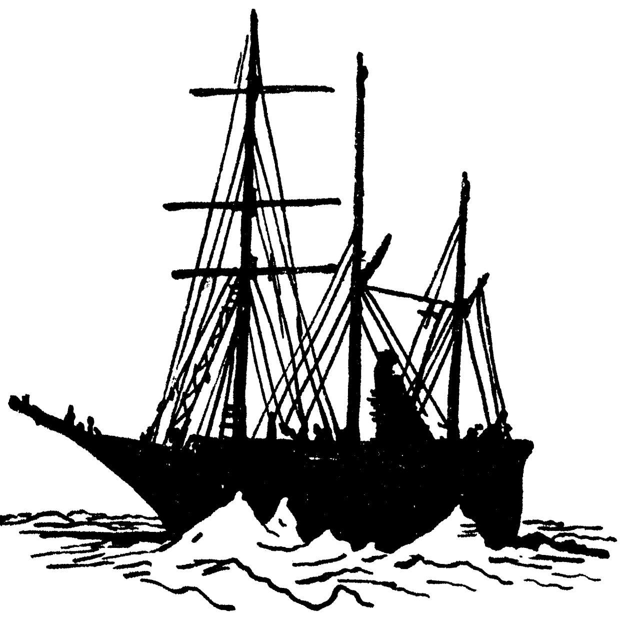
অভিযানের আর একটী উপকরণের পরিচয় দেওয়া বাকি আছে, সেটী হলো যে জাহাজে ক'রে এই অভিযান যাত্রা করে। স্কট বহু দেখেশুনে একটা পুরাণো তিমি-শিকারের জাহাজ কিনলেন, জাহাজটার নাম হলো Terra Nova, নতুন পৃথিবী!

নতুন মাটী, নতুন পৃথিবীর আবিষ্কারে তাঁরা চলেছেন, হয়ত সেই-জন্যে নামটা স্কটকে আকর্ষণ করে।

সাড়ে বারো হাজার পাউণ্ড দিয়ে এই জাহাজটা কিনতে হয় কিন্তু জাহাজের মালিকেরা সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন, যদি অভিযানের শেষে স্কট জাহাজটী ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে উপযুক্ত দাম দিয়েই তাঁরা আবার সেটাকে কিনে নেবেন।

স্কট তাতেই রাজী হন এবং ইভান্‌স্‌-এর ওপর ভার দিলেন, টেরা নোভাকে গড়িয়ে পিঠিয়ে অভিযানের উপযুক্ত করে তোলবার জন্যে।

ঘোষণা করলেন, ১৫ই জুন তাঁরা কার্ডিফ্‌ থেকে ইংলণ্ড ছেড়ে সমুদ্র-পথে নিউজীল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করবেন। ২৫শে নভেম্বর নিউজীল্যাণ্ডের লিটেলটন থেকে Port Chalmer's বন্দরে যাবেন, সেখান থেকে ২৯শে নভেম্বর, ১৯১০, মহা-অনির্দ্দিষ্টের পথে······



দক্ষিণ-মেরুর সমুদ্র-পথে

মাটীর সঙ্গে শেষ সম্পর্ক ত্যাগ করে টেরানোভা মেলবোর্ণ ছেড়ে খোলা সমুদ্রে এসে পড়লো। আর কোন বন্দর নেই, কোন শহর নেই, সামনে শুধু নীল জল আর সেই নীল জলের শেষে দক্ষিণ-মেরুর তুষার-তট-ভূমি।

মেলবোর্ণে টেরানোভা যখন এসে পৌঁছল, তখন বন্দরের একজন অফিসর এসে স্কটের হাতে একটা টেলিগ্রাম দিলেন। টেলিগ্রামটা তাঁর জন্যেই অপেক্ষায় ছিল।

স্কট টেলিগ্রাম খুলে পড়েন, বিস্মিত হয়ে যান, আবার পড়েন, মাত্র তিনটী শব্দ আর একটী নাম···am going South. Amundsen

নরওয়ের বিখ্যাত পর্য্যটক আমুনসেন এই টেলিগ্রামে অতি সংক্ষেপে তাঁকে জানিয়েছেন, তিনিও দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার জন্যে বেরিয়েছেন।

এই টেলিগ্রাম পাবার আগের মুহূর্ত্তেও স্কট কল্পনাতেও কখনো ভাবেন নি যে, যে-গৌরবের জন্যে তিনি এই অভিযানে বেরিয়েছেন, আর কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যাত্রা করেছে বা যাত্রা করতে পারে। আমুনসেন যে দক্ষিণ-মেরুতে যাবার আয়োজন করছেন, তার কোন খবরই জগতের কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নি। এর আগে অবশ্য আমুনসেন উত্তর মেরুতে অভিযানে বেরিয়েছিলেন এবং সকলেই জানতেন যে উত্তর মেরুই হলো তাঁর লক্ষ্য ; তিনি যে আবার দক্ষিণ মেরু অভিযানেও বেরুতে পারেন, এ অনুমান স্কট কল্পনাও করেন নি।

তাই আমুনসেনের এই টেলিগ্রামে তাঁর অভিযানের সমস্ত চেহারা বদলে গেল। সমস্ত জগৎ এখন তাঁদের দুজনের দিকে চেয়ে থাকবে, কে আগে দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবেন, স্কট না আমুনসেন? দক্ষিণ-মেরুতে প্রথম পদার্পণ করবার গৌরব ইংলণ্ডের না নরওয়ের?

যতই বাধা আর বিপত্তি থাক, পথ যতই দুর্গম হোক্, স্কট মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলেন, দক্ষিণ-মেরুতে তিনি পৌঁছবেনই এবং ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে তিনিই প্রথম তাঁর জাতির পতাকা সেই তুষার-রাজ্যে প্রোথিত করবেন। কিন্তু আমুনসেনের টেলিগ্রাম তাঁর সেই নিশ্চিন্ততা ভেঙ্গে চূরমার করে দিল। তাঁর দায়িত্ব আজ একনিমেষে শতগুণ বেড়ে গেল। অন্তরের গভীরে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন কিন্তু বাইরে তার কোন লক্ষণই ফুটে উঠলো না। অবিচলিত ভাবে তিনি তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চল্লেন। তাঁর ডায়েরীর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, আমুনসেনের কথা যেন তিনি ভুলেই গেলেন।

তাঁর সামনে একমাত্র লক্ষ্য, তিনি যে-কাজের জন্যে বেরিয়েছেন, দক্ষিণ-মেরুতে তাঁকে পৌঁছতেই হবে···এ ছাড়া আর কিছু ভাববার তাঁর অধিকার নেই!

মেলবোর্ণ ছাড়ার পর দুদিন সমুদ্রে যেরকম শান্ত পরিবেশের মধ্যে তাঁরা এগিয়ে চল্লেন, তাতে তাঁদের সকলের মনে বেশ আনন্দ আর উৎসাহ ভরে উঠলো। কিন্তু তৃতীয় দিনের রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ দেখা দিল মহা-দুর্দৈব। যে-যার কাজ সেরে বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় সমস্ত সাগর কাঁপিয়ে এলো প্রকাণ্ড ঝড়। দেখতে দেখতে সে-ঝড়ের মাত্রা বেড়ে হ্যারিকেনে পরিণত হলো। সাগরের ঢেউ উঠলো মেঘের দিকে মাথা তুলে। সে-ঢেউ-এর ধাক্কায় ছোট্ট

টেরানোভা মোচার খোলের মতন উঠতে নামতে লাগলো। প্রত্যেকে সারারাত যে-যার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় জাহাজকে সামাল দিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। ভোরের দিকে প্রকৃতি আরো ভয়ংকর হয়ে উঠলো। পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউ এসে জাহাজের ডেকের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বয়ে যেতে লাগলো। সামনে যা ছিল, সমস্ত ডেকে ছড়িয়ে পড়লো। বড় বড় কাঠের সিন্দুক দেশলাই-এর বাক্সোর মতন ডেকের এধার-ওধার করতে থাকে। সমুদ্রের গর্ভ থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে জীবন বিপন্ন ক'রে প্রত্যেকে সেই ঢেউ আর ঝড়ের সঙ্গে লড়াই-এ মেতে উঠলো।

সব চেয়ে বিপদ হলো, কুকুর আর ঘোড়াদের নিয়ে। মানুষের সঙ্গে আজ তারাও চলেছে দক্ষিণ-মেরুর পথে এবং দক্ষিণ-মেরুতে তাদের না হলে মানুষ চলতে ফিরতে পারবে না। সেই অজানা তুষার-দেশে তারাই হলো মানুষের সব চেয়ে বড় সহায়। সুতরাং এই ঢেউ আর ঝড়ের আক্রমণ থেকে তাদের বাঁচাতেই হবে। তারা তুষার-দেশের বাসিন্দা, এই তরঙ্গ আর এই ঝড়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। ঝড়ের গর্জ্জনে জাহাজ দোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূক অন্তরে আর্ত্তনাদ জেগে ওঠে, তারা ভীত হয়ে পড়ে। ঘোড়াদের থাকবার জায়গা যেখানে করা হয়েছিল, ঢেউ এসে সেখানে আছড়ে পড়তে লাগলো। ক্যাপটেন ওটসের ওপর ভার ছিল, এই কুকুর আর ঘোড়াদের দেখাশোনা করার। সেই ঝড় আর ঢেউ-এর তাণ্ডবের মধ্যে অবিশ্রান্ত দুদিন ধরে ওটস্ যেভাবে ঢেউ আর ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে সেই জন্তুদের রক্ষা করেন স্কটস্ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "মানুষের শক্তিতে তা অসম্ভব। এক এক সময় এমন হয়েছে, ঢেউ এসে কোন ঘোড়াকে টেনে সমুদ্রের বুকে

নিয়ে যাচ্ছে, ওটস্‌ ঘোড়াটাকে নিজের কাঁধে তুলে যেন ধরে রাখছে, মানুষের শক্তিতে তা কি করে সম্ভব হয় ভেবে পাওয়া যায় না। ঝড় আর ঢেউ-এর মধ্যে ওটসের সেই চেহারা দেখে মনে হয়েছে, নিশ্চয়ই মানুষের এই নরম মাংসপেশীর আড়ালে কোথাও এমন শক্তি লুকিয়ে আছে যার সাহায্যে মানুষ সত্যি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।"

এইদিনই ওটসের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা কুকুর ঢেউ-এর টানে সমুদ্রের গর্ভে চলে গেল, দেখতে দেখতে পর মুহূর্তে সমুদ্রের ভেতর থেকে আর একটা ঢেউ এসে সেই কুকুরটাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। ওটসের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ঘোড়া সমুদ্রে হারিয়ে গেল, আর একটা ঘোড়া সারা রাত সারাদিন সেই ঢেউ-এর সঙ্গে যোঝার ফলে অবসন্ন হয়ে মরে গেল।

ওধারে জাহাজের গায়ে তুতিন জায়গায় ফাটল দেখা দিলো, হু হু করে সমুদ্রের জল সেই ফাটলের ভেতর দিয়ে জাহাজের খোলে ঢুকতে লাগলো। একদল লোক সেই জল আর তেলের ভেতর ডুবে ফাটল মেরামত করতে লাগলো আর চব্বিশজন লোক অনবরত বালতি করে জল তুলে সমুদ্রে ফেলতে লাগলো।

এইভাবে নাস্তানাবুদ করে তুদিন পরে সমুদ্র আবার শান্ত হলো। ধীরে ধীরে টেরানোভা আবার তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে ঝড়ে সামান্য উত্যক্ত হলেও আর বিশেষ কোন বড় রকম বিপদের মধ্যে তাকে পড়তে হয় নি।

এইভাবে ক্রমশ টেরানোভা দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলের সীমারেখার মধ্যে এসে পড়লো। ছোট ছোট সব পাথুরে দ্বীপ দেখা যেতে লাগলো। এইসব দ্বীপে কোন মানুষই থাকে না। আগে অনেক জাহাজ ঝড়ে

বিতাড়িত হয়ে এই সব পাথুরে দ্বীপের ধাক্কায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। জাহাজের কোন কোন যাত্রী কোন রকমে এই দ্বীপে উঠে প্রাণরক্ষা করেছে কিন্তু বেশীদিন টিকে থাকতে পারে নি কারণ এই সব দ্বীপে এক কণাও খাদ্য পাওয়া যায় না। এই সব দ্বীপের ভেতর এই রকম-ভাবে-মরা বহু মানুষের কংকাল দেখা যায়। সেইজন্যে আজকাল এই সব দ্বীপে মাটী খুঁড়ে খাদ্য আর দরকারী জিনিস-পত্র সঞ্চয় করে রেখে দেওয়া হয়, যদি কোন ডুবো জাহাজের যাত্রী সেই দ্বীপে এসে পড়ে তাহলে সেই খাদ্যের সাহায্যে কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারবে। এই সব দ্বীপের চেহারা থেকেই স্ফট বুঝতে পারলেন তাঁরা এবার দক্ষিণ মেরু-সমুদ্রের দিকেই এগিয়ে চলেছেন।

জাহাজের ওপর তাঁর ঘরে দূরবীণ নিয়ে সুদূর দিক-রেখার দিকে চেয়ে থাকেন। কখন দেখা যাবে মেরুর তুষার-তট-রেখা। দেখতে দেখতে সেই নীল-জলের তরঙ্গ-রোলের একঘেয়েমি ভেঙ্গে একটী দুটী করে পাখী দেখা দেয়। মেরু-অঞ্চলের পাখী। ক্রমে চোখে পড়ে দক্ষিণ-মেরুর অগ্রদূতরূপে বিরাট-দেহ Albatross পাখী। ভাসমান মৃত-তিমির পচা-মাংস হলো তাদের খাদ্য এবং এমন আকণ্ঠ খায় যে খাওয়ার পর তারা অনেক সময় আর উড়তে পারে না।

ক্রমশ সমুদ্রের ফিকে নীল রঙ গাঢ় নীলে পরিণত হয়। এই রঙের পরিবর্ত্তনের কারণ হলো, এখানকার ঠাণ্ডা জলে আদিমকাল থেকে ভেসে বেড়ায় সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম প্রাণ-বিন্দু, বৈজ্ঞানিকেরা এই ক্ষুদ্র ভাসমান এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণীকে বলে plankton...এখানকার সমুদ্র জলের ওপর তারা ছেয়ে থাকে। এই plankton-ই হলো এই অঞ্চলের বহু সামুদ্রিক জীবের খাদ্য। ক্ষুদ্রতম plankton থেকে বৃহত্তম তিমি

পর্য্যন্ত, মেরু-অঞ্চলের প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক হলো, খাদ্য আর খাদ্যকের সম্বন্ধ। পরস্পর পরস্পরকে খেয়ে বেঁচে আছে।

টেরানোভা ক্রমশ তিমিদের রাজ্যে এসে পড়ে। plankton যেমন ক্ষুদ্রতম প্রাণী, তেমনি এই তিমি হলো সমুদ্রের বৃহত্তম প্রাণী। তিমি-শিকারীরা এইখানে এসে তিমি শিকার করে ফিরে যায়। তিমিদের গায়ে এত বেশী চর্ব্বি যে তারই লোভে মানুষ সমুদ্র-তরঙ্গ তুচ্ছ করে তিমি-শিকার করতে আসে। তিমিদের দেহের চর্ব্বি গলিয়ে যে তেল পাওয়া যায় ব্যবসা-জগতে তার বিরাট চাহিদা। অর্থের লোভে মানুষ যায়নি পৃথিবীতে এমন জায়গা নেই এবং করতে পারে না হেন কাজ নেই। প্রত্যেক বছরে দুবার করে তিমি-শিকারীরা এই অঞ্চলে আসে এবং প্রায় দশহাজার তিমির মৃতদেহ নিয়ে চলে যায়। এই দশহাজার তিমির দেহ থেকে যে তেল পায় তার দাম প্রায়, দশ বছর আগেকার বাজার দরে আট কোটি পাউণ্ড।

প্রায় সাত-আট রকমের তিমি আছে। তারা অধিকাংশই নিরীহ আর একটু বোকা ধরণের। মানুষ-শিকারী দেখলে আজও তারা পালাতে শেখেনি। কিন্তু একরকমের তিমি আছে, তাদের বলে killer-whale, সেগুলো যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি হিংস্র, মেরু-সাগরের জল জমে যখন বরফ হয়ে যায়, তখন তারা সেই বরফের তলায় তলায় অদৃশ্যভাবে ঘুরে বেড়ায়। বরফের ওপর পেঙ্গুইন পাখীর দল এসে বসলে, তারা বুঝতে পারে, তখন তলা থেকে দাঁত দিয়ে তারা এমন ভাবে বরফে ফাটল ধরায় যে পেঙ্গুইনগুলো ভারী দেহ নিয়ে জলে পড়ে যায়, তখন একসঙ্গে দশ বারোটা সেই বিরাট-দেহ পেঙ্গুইনকে এক একজনে অনায়াসে উদরস্থ করে ফেলে।

নতুন বিপদ

৭ই ডিসেম্বর স্কটের নজরে পড়লো প্রথম আইস্‌বার্গ। সঙ্গীহারা মাত্র একটী বরফের ছোট পাহাড় নীল সাগরের জলে ভেসে চলেছে। পরের দিন স্কট দেখলেন, আরো দুটী আইসবার্গ এগিয়ে আসছে। বাতাসের চেহারা হঠাৎ যায় বদলে। জমাট তুষারের হিমেল হাওয়া টেরানোভার গায়ে এসে লাগে। জাহাজ যতই এগিয়ে যায় বাতাস ততই হিমে ভারী হয়ে ওঠে।

ক্রমশ ছোট বড় নানান সাইজের আইস্‌বার্গ চারদিক থেকে ভেসে আসে। স্কটের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে, সেই হিমেল হাওয়া থেকে বুঝতে পারেন, সামনেই pack-ice-এর ক্ষেত্র, এই pack-ice হলো জাহাজের মহাশত্রু। জাহাজের পথ রোধ করে মাইলের পর মাইল পড়ে থাকে এই pack-ice, যেন সমুদ্র বরফে জমাট হয়ে গিয়েছে, এই pack-ice-এর বিরাট বাধা ঠেলে জাহাজ এগুতে পারে না। এক-একটা pack দশ মাইল থেকে আরম্ভ করে একশো মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং সমুদ্রের জলের ওপর প্রায় দুশো ফিট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। স্কট দূরবীণে দেখেন, সামনেই বিরাট এক pack-ice-এর শাদা রেখা। ভাসমান আইসবার্গগুলো যেন তার প্রহরীরূপে তাঁকে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়ে গেল।

এই pack-ice-এর ভেতর দিয়ে শহরের ছোট ছোট গলিরাস্তার মতন জলের ছোট ছোট গলি পাওয়া যায়। এই গলির ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে ফিরে জাহাজকে এগুতে হয়, তার ফলে জাহাজের

গতি একান্ত শ্লথ হয়ে যায়। তার ওপর বিপদ হয়, যখন হঠাৎ এই জলের গলির পথ তুধারকার বরফের চাপে বন্ধ হয়ে যায়, তখন জাহাজকে অচল অবস্থায় সেই বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং অনেকক্ষেত্রে সাত-আটদিনও এইভাবে আটক পড়ে থাকতে হয়।

স্কটের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। কারণ, মেরু-অভিযানে সময় হলো সবচেয়ে দামী জিনিস। সময়ের অপচয় যে কতবড় মারাত্মক অপচয় তা এই মেরু-অভিযানে বোঝা যায়। সব জিনিস এখানে সময় ধরে হিসেব করে মাপা। জাহাজে যে-কয়লা আছে, সে-কয়লা একটা সময় ধরে মেপে নেওয়া হয়েছে, সে-সময়ের একদিন বেশী হয়ে গেলে, একদিনেরও কয়লার অভাব পূরণ করবার কোন উপায় নেই সেখানে। তেমনি সব বিষয়ে, বিশেষ করে খাদ্য সম্পর্কে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ধরে হিসেব করে খাদ্য সঙ্গে নিতে হয়েছে। সে নির্দ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেই, খাদ্য ফুরিয়ে যাবে, তখন লক্ষ টাকা খরচ করলেও এক চামচে চিনি বা এক আউন্স স্পিরিট পাওয়া যাবে না। তাই সময়ের অপচয়ে সব চেয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে অধিনায়কের মন।

সেই সঙ্গে জেগে ওঠে আর এক ভাবনা, যে-ভাবনাকে মনের গভীরে জোর করে বন্দী করে রেখেছেন। মেলবোর্ণের সেই টেলিগ্রাম! আমুনসেন এতক্ষণে কোথায়? আজ এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছে......শুধু তাঁর ব্যক্তিগত মান-সম্মান বা যশ নয়, একটা সমগ্র জাতির মান-সম্মান তাঁর ওপর নির্ভর করছে। একটি দিনের বিলম্বের জন্যে হয়ত সেই ঐতিহাসিক সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন তিনি, বঞ্চিত করবেন একটা সমগ্র জাতিকে। তাই সেই pack-ice-এর

বাধায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে স্কটের মন। কিন্তু নিরুপায়……এ এমন এক বাধা যার বিরুদ্ধে করবার তাঁর কিছু নেই। জাহাজের গতি একান্ত শ্লথ করলেও খুব হুঁসিয়ারের সঙ্গে এই pack-ice-এর ভেতর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে যেতে হবে। কারণ তুধারের বরফের মাঝখান দিয়ে যে-জলপথটুকু পাওয়া যায়, অনেক সময় তার ভেতর ice-berg ঢুকে পড়ে। সেই আইসবার্গের সামনে যদি জাহাজ পড়ে যায়, তাহলে জাহাজের আর রক্ষা নেই, আইসবার্গের ধাক্কায় তাকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে হবে। চোখের সামনে জলের ওপর আইসবার্গের যতটুকু অংশ ভেসে থাকে, সেটা হলো তার সমগ্র দেহের আটভাগের এক ভাগ মাত্র, বাকি সাতভাগ জলের তলায় থাকে। অর্থাৎ সামনে যদি তুশো ফিট উঁচু একটা আইসবার্গ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার চোদ্দ শ' ফিট ডুবে রয়েছে। সুতরাং তার ধাক্কা যে কি প্রচণ্ড হতে পারে, অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দাঁড়ায়, জাহাজ আর নড়বার পথ পায় না। তুধার থেকে তুষার-ক্ষেত্র চেপে ধরে। একদিন, তুদিন, তিনদিন, অচল, অনড়, অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সেই সময়টুকুও তাঁরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। যাঁরা বরফের ওপর ski করতে জানতেন না, স্কটের আদেশে তাঁরা জাহাজ থেকে নেমে বরফের ওপর ski করা প্র্যাক্‌টিস্ করতে থাকেন। জাহাজের ওপর থেকে ski-রত তাঁদের দেখে স্কটের মনে জেগে ওঠে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আমুন্‌সেনের দলের কথা, মনে পড়ে এই জন্যে যে, নরওয়ে-দেশের লোকেরা এই ski-ing বিদ্যায় জগতে অদ্বিতীয়, আর মেরুর তুষার-পথে ski-ing হলো সব চেয়ে দরকারি জিনিস।

এইভাবে pack-ice-এর দয়ার ওপর নির্ভর করে ধীরে ধীরে তাঁরা এগিয়ে চলেন এবং এরই মধ্যে এলো Christmas Day. যথারীতি সেদিন জাহাজে তাঁরা ক্রিশ্‌মাস্‌ উৎসব ঘটা করে পালন করলেন। সেদিনকার ডিনারে আলাদা করে পেঙ্গুইন পাখী আর শীলের মাংসের আয়োজন করা হলো। দলের মধ্যে যাঁরা প্রথম মেরু-অঞ্চলে আসছিলেন, তাঁদের এই মাংস যে খুব তৃপ্তিদায়ক লাগলো তা নয় কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে য়ুরোপের লোকেরা আমাদের মতন জিভের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে না। তাঁরা প্রকৃতই মাংসাশী, অর্থাৎ যেকোন জন্তুর মাংস খেয়ে তাঁরা বেঁচে থাকতে পারেন এবং দরকার হলে খান। স্কটের মতন মেরু-অঞ্চলের সঙ্গে যাঁদের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁরা জানতেন মেরু-অভিযানের স্বাভাবিক খাদ্যই হলো পেঙ্গুইন আর শীলের মাংস। স্কটের এই অভিযানেই এমন একদিন আসবে, যেদিন সঙ্গের পণি-ঘোড়াকে হত্যা ক'রে তার মাংস খেয়েই তাঁদের পেট ভরাতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে দানবীয় সংগ্রাম ক'রে পশ্চিমের লোকেরা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক আধিপত্য অর্জ্জন করেছে, আমরা খাদ্যাখাদ্য বিচার করে ঘরের কোণে বসে দর্শনের আলোচনা করেছি।

জনহীন মেরু-সমুদ্রে ক্রিস্‌মাস্‌ উৎসব। রীতিমত ঘটা করেই তাঁরা সে-উৎসব পালন করলেন। য়ুরোপীয়দের চরিত্রের এই আর একটা বৈশিষ্ট্য, তাঁরা দল বেঁধে যেখানেই যান, সেখানেই তাঁদের উৎসবকেও সঙ্গে নিয়ে যান। কাজকে তাঁরা যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেন, উৎসবকেও ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিস্‌মাস্‌ উৎসবের প্রধান অঙ্গরূপে স্কট ঘোষণা করলেন, ডিনারের পর প্রত্যেক যাত্রীকেই একটা করে গান গাইতে হবে। সেই বিচিত্রগানের

মজলিসের বিচিত্র সুরে মেরু-সমুদ্রের সুনীল নীরবতা ঘন ঘন কেঁপে ওঠে।

এর চারদিন পরে, অর্থাৎ ২৯শে ডিসেম্বর স্কট মুক্তির শ্বাস ফেলে দেখলেন, সামনে আবার প্রশস্ত সমুদ্র, বরফের অত্যাচারের শৃঙ্খল থেকে টেরানোভা মুক্ত হয়েছে। গায়ে এসে লাগে, তুষার-সম্পর্ক-হীন দক্ষিণের স্নিগ্ধ লোণা হাওয়া। জাহাজের লগ্ খুলে হিসেব করে দেখেন, pack-ice-এ আটক পড়ার দরুণ তাঁর কুড়ি দিন সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আবার মনে জেগে ওঠে সেই প্রশ্ন, আমুনসেন এখন কোথায় ?

এ প্রশ্নের উত্তর জানবার তখন স্কটের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু আমরা জানি, আমুনসেন তখনও পাঁচশো মাইল পেছনে সমুদ্রে পড়ে ছিলেন কিন্তু যেখানে স্কট কুড়িদিন তুষারে বন্দী হয়েছিলেন, আমুনসেন সেখানে কোন তুষার-বাধা না পেয়ে মাত্র ৪ দিনে এই পথ উৎরে যান।



মেরুর মাটীতে

নিশীথ-সূর্য্যের স্তিমিত আলোয় টেরানোভা দক্ষিণ-মেরুর দিকে এগিয়ে চলেছে, তার ডেকে আজ রাত্রি-নিশীথে সব যাত্রী জেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ আজ বৎসরের শেষ দিন, মধ্য-রাত্রে জন্মগ্রহণ করবে নব-বর্ষের প্রথম দিন···প্রতিবৎসর তাঁরা এই মুহূর্ত্তটীকে সজাগভাবে যেরকম করে অভিনন্দিত করেছেন, আজ এই মেরু-সমুদ্রের নিশীথ-নিস্তব্ধতার বুকেও ঠিক তেমনিভাবে তাকে অভিনন্দিত করবেন! সকলেই অপেক্ষা করে আছেন রাত বারোটা বাজার জন্যে।

রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ মেরু-সমুদ্রে ষোলটা ঘণ্টা একসঙ্গে ঘন ঘন বেজে উঠলো···ঠিক যেমন এই মুহূর্ত্তে বাজছে ইংলণ্ডে প্রতি শহরে, প্রতি গীর্জ্জায়···টেরানোভার সাইরেন চীৎকার করে উঠলো···ফগ্‌হর্ণগুলো সব একসঙ্গে বেজে উঠলো···ডেকের ওপর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাত্রীদল একসঙ্গে গেয়ে উঠলো, নব-বর্ষের বন্দনা-গান··· সারারাত্রি কেটে গেল উৎসবে, সঙ্গীতে, চীৎকারে···ভোরের দিকে যে-যার কেবিনে শয্যায় কম্বল মুড়ি দিয়ে যেই শুতে যাবে, অমনি আবার উল্লাসে বেজে ওঠে টেরানোভার সাইরেন···মেগাফোনের ভেতর দিয়ে নাবিকরা চীৎকার করে উঠলো, Land Ho!

যে-যার কম্বল গায়ে জড়িয়ে কেবিনের বাইরে ছুটে আসে, সামনে চেয়ে দেখে, স্বপ্নের দেশে যেন জেগে উঠছে মায়া-পুরী, সেই মেরু-প্রভাতের রহস্যময় আলোয় অদূরে দিক-রেখায় ফুটে ওঠে তুষার

মহাদেশের তটভূমি! স্কট তাঁর ডায়েরীতে লেখেন, জগতের বহু দেশে ঘুরেছি, সমুদ্রে পর্ব্বতে প্রান্তরে প্রকৃতির বহু বিচিত্র রূপ দেখেছি কিন্তু সেই মেরু-প্রভাতের রহস্যময় আলোয় অদূরে দক্ষিণ-মেরুর তট-রেখার আলো-ছায়ায় আঁকা যে বিচিত্র কোমল ছবি, তার তুলনা কোথাও নেই!

কে যেন বিচিত্র নরম রঙ দিয়ে মায়া-তুলির সাহায্যে স্বপ্ন-লোকের প্রবেশ-দ্বারের ছবি এঁকে রেখেছে। এখানকার বাতাসে এককণাও ধূলো নেই, জল-বিন্দু নেই...বাতাস আশ্চর্য্য স্বচ্ছ আর পরিষ্কার: তাই তার ভেতর দিয়ে প্রকৃতির রূপ এক বিচিত্র রহস্যময় লাগে। এখানকার আলো-বাতাসের বিচিত্র স্পন্দনের দরুণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দূর থেকে বড়ই বিচিত্র লাগে। সামনে পাহাড়গুলো মনে হয় যেন স্বপ্নের দেশের পাহাড়, স্কট লিখেছেন ghost mountains···যেন পাহাড়ের ছায়া-মূর্ত্তি···মনে হয় যেন কোন কঠিন মাটির ভিৎ থেকে তারা ওঠে নি, যেন একরাশ ধোঁয়ার ভেতর থেকে তারা ফুটে উঠেছে, ভীৎ-হীন ভেসে বেড়াচ্ছে···তাদের চূড়া স্পষ্ট নয়, কোনটা মনে হয় যেন খুব ছোট, কোনটা আবার মনে হয় মেঘের মধ্যে মিশে গিয়েছে···

তার দুদিন পরে, ২রা জানুয়ারী, চোখে পড়লো, ইরেবাস্ পাহাড়···

এই অভিযানের একজন প্রধান ব্যক্তি, চেরী গারার্ড, দক্ষিণ-মেরু সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বই-তে লিখছেন, জাপানে আমি দেখেছি ফুজী পাহাড়ের রূপ, অপরূপ বিস্ময়কর, মায়াময়···ভারতে দেখেছি সূর্য্যা-লোকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, একমাত্র মাইকেল এন্‌জেলোর মতন কবি-চিত্রকর যার বিরাট গম্ভীর সৌন্দর্য্যের অনুধাবন করতে পারেন, কিন্তু হায়, আমার মন কেড়ে নিয়েছে ইরেবাস্ পাহাড়···

ক্রমশ সামনে এগিয়ে আসে The Great Ice Barrier···হঠাৎ সমুদ্র থেকে উঠেছে, দুশো ফিট উঁচু চির-তুষারের প্রাচীর···দক্ষিণ-মেরু মহাদেশের দ্বার-রক্ষী···কেপ্ ক্রোজিয়ার থেকে কিং এডওয়ার্ড ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্র তট-রেখাকে ঘিরে পড়ে আছে পাঁচশো মাইল দীর্ঘ তুষার-প্রাচীর...

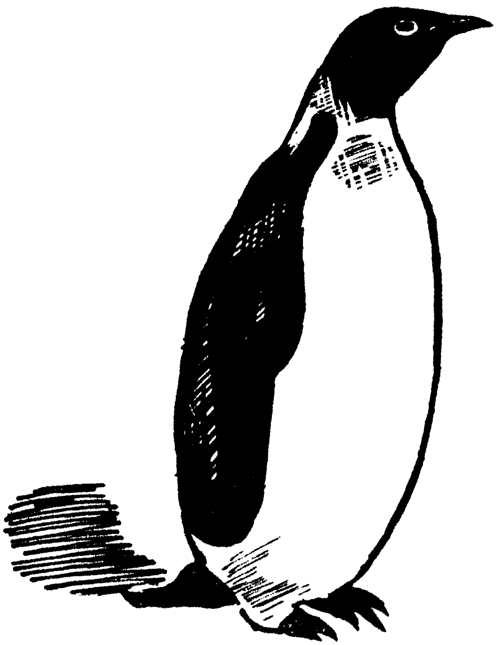
তুষার-প্রাচীরের দিকে টেরানোভা যতই এগিয়ে চলে, ততই নাকে এসে লাগে এক বিচিত্র গন্ধ···তট-রেখার ওপর হাজার হাজার পেঙ্গুইন-পাখীর বাসার গন্ধ···মাটীর গন্ধ···সমুদ্রের লোণা জলের একঘেয়ে গন্ধের পর বড় ভাল লাগে এই মাটীর গন্ধ···হোক্ না সে-মাটী চির-তুষারে ঢাকা! উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অভিযাত্রীদের মন!

প্রত্যেকে দূরবীণ নিয়ে সামনে চেয়ে দেখে, নুড়ি-ভরা তট-রেখার ওপর দীর্ঘ লাইন ধরে হাজার হাজার পেঙ্গুইন পাখী গম্ভীরভাবে মুখে নুড়ি নিয়ে যে-যার বাসা সাজাচ্ছে···মিসেস্ পেঙ্গুইন সেই নুড়ির বাসার ওপর ডিম পাড়বে, তাই মিঃ পেঙ্গুইন সারাদিন নুড়ি খুঁজে বেড়ায়···এক-একটী করে নুড়ি এনে নুড়ির ঢিপি তৈরী করে! কোন কোন বাসার ধারে চুপটী করে আড়ালে দলছাড়া দু'একটা পেঙ্গুইন দাঁড়িয়ে আছে···এরা হলো পেঙ্গুইন সমাজের অকর্ম্মা, অলস···এদের কাজ হলো অপরের বাসা থেকে সময় বুঝে নুড়ি চুরি করা, কারণ অত খেটে নুড়ি সংগ্রহ করবার প্রবৃত্তি তাদের নেই···অথচ নুড়ি সংগ্রহ করতেই হবে নইলে তাদের মিসেস পেঙ্গুইনরা রেগে যাবেন, নুড়ি-বিহীন খালি মাটীতে ডিম প্রসব করা পেঙ্গুইন নারীর পক্ষে বড় দৈন্য, বড় লজ্জার কথা!

টেরানোভার সাইরেনের ডাকে পেঙ্গুইন পাখীরা ঘাড় তুলে দেখে··· দেখে সমুদ্রে কি একটা বিচিত্র জীব···ওয়াক্···ওয়াক্ শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে তটভূমি···কে এলো তাদের দেশে ?

পেঙ্গুইন পাখীরা দলে দলে এগিয়ে আসে জলের দিকে, ভারিক্কি চালে, হেলতে দুলতে···

টেরানোভা নঙ্গর ফেলে···



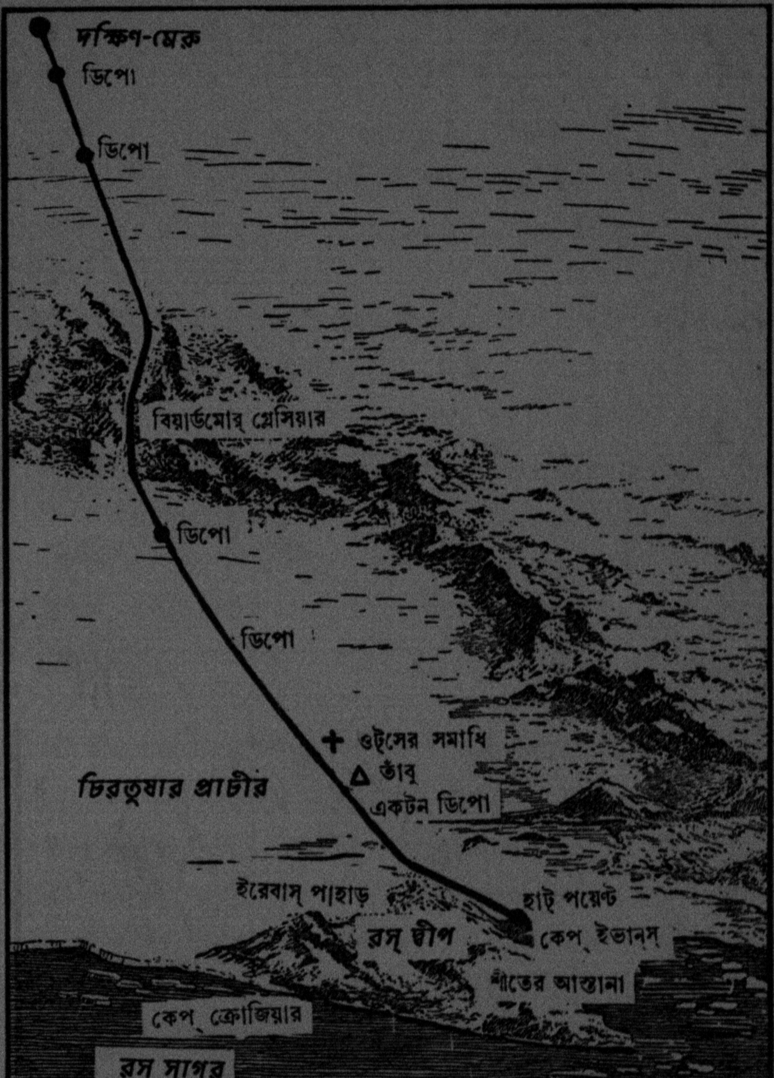
হাট্ পয়েণ্ট *

এখন কথা হলো, কোথায় নামা যায়? কোথায় তৈরী করতে হবে হাট্ (hut) বা কুটীর যেখানে সমস্ত জিনিস-পত্র নামাতে হবে, যেখানে থেকে সমস্ত অভিযানের আয়োজন করতে হবে এবং অভিযান শেষে যেখানে থেকে ফিরতে হবে।

এই হাট্-পয়েণ্ট নির্ব্বাচন করা হলো দলের অধিনায়কের প্রথম দায়িত্ব এবং মস্ত বড় দায়িত্ব···কারণ দীর্ঘ দিন এইখানে থাকতে হবে··· শীতের নিদারুণ দিন না আসা পর্য্যন্ত এই হাট্-ই হবে তাঁদের আশ্রয়। মেরুর মাটীতে হাট্ পয়েণ্টই হলো তাঁদের প্রথম বাড়ী, আশ্রয়, ভাঁড়ার, মিলন-কেন্দ্র। সুতরাং এমন জায়গায় এই হাট্ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ঝড় আর তুষার-ঝঞ্ঝার সোজাসুজি আক্রমণ না সইতে হয়। ডিস্কভারী অভিযানের সময় স্কট যেখানে হাট্ পয়েণ্ট গড়ে তুলেছিলেন, সেটা কেপ্ ক্রোজিয়ারের পেঙ্গুইনদের আড্ডার কাছেই ছিল। বৈজ্ঞানিকদলের নেতা উইলসনের ইচ্ছা ছিল যে সেইখানেই এবারও হাট্ পয়েণ্ট গড়ে তোলা হয়; তাহলে পেঙ্গুইনদের সম্বন্ধে গবেষণা করার খুব সুবিধা হয়। কিন্তু স্কট তাতে রাজী হলেন না। সে জায়গাটা এখন এমন খোলামেলা হ'য়ে গিয়েছে যে চারিদিক থেকে বাতাসের আক্রমণ সহ্য করতে হবে। সেইজন্যে তিনি এমন একটা জায়গা খুঁজছিলেন, যেখানে অন্তত একটা দিক থেকে তিনি একটা আড়াল পেতে পারেন।

---

* ম্যাপ দেখো।



মেরু-অভিযানের মানচিত্র

টেরানোভা থেকে একটা ছোট্ট বোটে নেমে তিনি খানিকটা তটরেখা ধরে ঘোরাফেরা করতেই তাঁর মনের মতন একটা চমৎকার জায়গা পেয়ে গেলেন, কেপ ক্রোজিয়ার ছাড়িয়ে রস্ দ্বীপের পশ্চিম দিকে কেপ্ ইভান্সের উত্তরে। ম্যাপে জায়গাটা দেখলেই বুঝতে পারবে, দুটো উঁচু জায়গার মাঝখানে হওয়ার দরুণ, অন্তত দুদিক থেকে হাওয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার একটা প্রাকৃতিক সাহায্য পাওয়া যাবে। স্কট সেইখানেই হাট্ পয়েন্ট গড়ে তোলবার আদেশ দিলেন। সুরু হলো, জাহাজ থেকে একে-একে সমস্ত জিনিস নামানোর পালা।

বোয়ার্সে'র ওপর ভার পড়লা, সমস্ত জিনিস জাহাজ থেকে নামিয়ে যথাযোগ্যভাবে হাট্ পয়েন্টে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখার। এবং এই কাজ বোয়ার্স এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করলেন যে, স্কট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, 'এসব ব্যাপারে বোয়ার্স হলো organising genius! সমস্ত জিনিস টেরানোভা থেকে নামিয়ে, বরফের ওপর দিয়ে নিয়ে এসে হাট্ পয়েন্টে সাজিয়ে রাখতে পুরো আট দিন চলে গেল।

মেরু-অভিযানে যাঁরা যে কাজের ভার পান, ধরেই নেওয়া হয় যে সেকাজটা তাঁরা নিখুঁতভাবেই করবেন, একটা মিনিট সময় বাজে নষ্ট করা হবে না, একটা সামান্য দেশলাই-এর কাটি পর্য্যন্ত নষ্ট করা চলবে না এবং সমস্ত কাজটা এমন একটা শৃঙ্খলার মধ্যে হবে যাতে পরে কারুর কোন অসুবিধা না হতে পারে। এই নিখুঁতভাবে কাজ করার পেছনে একটা গোপন আশা সকলের মনে ছিল। সকলেই এই হাট্ পয়েন্টের প্রত্যেকটী কাজের ভেতর দিয়ে দলপতির দৃষ্টি ও সুখ্যাতি আকর্ষণ করতে চান, কারণ প্রত্যেকের মনেই ছিল সেই দুরাকাঙ্ক্ষা, দক্ষিণ-মেরুর পথে শেষ-অভিযানে যাতে তিনি অন্তর্ভুক্ত

হন। স্কট আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর দলের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত যে চারজনকে সবচেয়ে তিনি যোগ্য মনে করবেন, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার শেষ অভিযানে তাঁরাই হবেন তাঁর সঙ্গী। কাজের ভেতর দিয়ে তাই প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে থাকেন, যাতে সেই চরম গৌরবের পথে সহযাত্রী হিসাবে তাঁরা নির্ব্বাচিত হতে পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রের মতন, এখানে দলপতির ইচ্ছাই সব, দলপতির নির্ব্বাচনকে মাথা পেতে নিতে হবে সবাইকে। এবং দলপতিকেও এমন ভাবে চলতে হবে, যাতে কোন সহযাত্রী সঙ্গী তাঁর বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মনোভাব না পোষণ করতে পারে।

তাই বোয়ার্সের ওপর যখন আদেশ হলো, টেরানোভা থেকে জিনিস-পত্র নামাবার, বোয়ার্সের লক্ষ্য ছিল যাতে একটা সামান্য জিনিসও না নষ্ট হয়। জাহাজ থেকে নামিয়ে বরফের ওপর দিয়ে সে সব জিনিস টেনে নিয়ে গিয়ে হাটু পয়েন্টে তোলা, খুব সহজ কাজ ছিল না। বোয়ার্সের এত চেষ্টা সত্ত্বেও, একটা মোটর যন্ত্র এক জায়গার নরম বরফের তলা দিয়ে একেবারে সমুদ্রে পড়ে তলিয়ে গেল।

এছাড়া, নামানোর সময় আর একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা একটুর জন্যে বেঁচে গেল। মেরুর এই অজানা তুষার-পথের নিরবিচ্ছিন্ন শুভ্রতার মধ্যে কোথায় যে দুর্ঘটনা, এমন কি মৃত্যু লুকিয়ে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না। তাই প্রতি মুহূর্ত্তে এখানে সজাগ থাকতে হয়, প্রত্যেক পদক্ষেপটা ভেবে চিন্তে ফেলতে হয়। সব জায়গায় বরফ সমান কঠিন নয়, চোরাবালির মতন মাঝে মাঝে অগঠিত নরম বরফ সব থাকে যার ভেতর পড়লে নিমেষে তলিয়ে যেতে হবে, যেকোন মুহূর্ত্তে বরফে ফাটল ধরতে পারে এবং সেই ফাটলের ফাঁকে সুগভীর সমুদ্র,

সে-সমুদ্রের জলে মাথা তুলে উঁকি মারছে নরখাদক সব killer whale.

ঠিক এমনি মৃত্যু-শঙ্কার মধ্যে পড়ে যান পনটিঙ। টেরানোভা থেকে তখন জিনিস-পত্র সব নামানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একে একে কুকুরদের নামানো হচ্ছে। দুটো কুকুরকে নামিয়ে সামনের ভাসমান একটা বরফের চাঁই-এর ওপর লোহা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। হঠাৎ পনটিঙের নজরে পড়লো সমুদ্রের দিক থেকে সেই বরফের চাঁই-এর চারদিক ঘিরে Killer-whaleদের মাথা উঠছে আর নামছে। এত কাছে সেই জন্তুদের পেয়ে Ponting ফটো নেবার জন্যে ক্যামেরা নিয়ে ছুটলেন। পনটিঙকে আসতে দেখেই তিমিগুলো জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পনটিঙ ক্যামেরা ঠিক করে অপেক্ষা করে আছেন, মাথা তুল্লেই তিনি ফটো নেবেন, এমন সময় পায়ের তলায় সমস্ত বরফের চাঁইটা দুলে উঠলো, কুকুর দুটো চীৎকার করে উঠলো···আর একটু হলেই পনটিঙ পা টলে জলে পড়ে যেতেন, বহু কষ্টে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, দেখেন একরাশ তিমি পিঠ দিয়ে বরফের চাঁইটাকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করছে···এক মুহূর্ত আর বিলম্ব না করে হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে কুকুর দুটোকে নিয়ে পনটিঙ সেই বরফের চাঁইটা ছেড়ে আর একটা চাঁই-এর ওপর এসে দাঁড়ালেন···সঙ্গে সঙ্গে বরফ ফাটার একটা শব্দ হলো, পনটিঙ সভয়ে দেখেন যে-বরফের চাঁইটা ছেড়ে এসেছেন তার মাঝ বরাবর জায়গা তিমিগুলো ফাটিয়ে ফেলেছে··· মাথা তুলে তারা চারদিকে চেয়ে দেখছে তাদের শীকার কোথায় পালালো! আর কয়েক মুহূর্ত দেরী হলে পনটিঙ আর সেই দুটো কুকুর Killer-whaleদের পেটে চলে যেতো।

মেরু-জগতের প্রাণীদের মধ্যে Killer-whale যেমন ভীষণ ভয়াবহ আর বুদ্ধিমান, তেমনি নিরীহ আর বোকা হলো পেঙ্গুইনগুলো। শাদা বরফের মধ্যে কালো ডানার পোষাকে ভারিক্কি চালে ভারী দেহ নিয়ে যখন পেঙ্গুইনরা গম্ভীরভাবে হেঁটে চলে, তাদের ভাব-ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায়, তারা রীতিমত aristocrat…যখন কুকুরগুলোকে নামিয়ে বরফের ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে, কোথা থেকে একদল পেঙ্গুইন সেই নবাগতদের দেখে গম্ভীরচালে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। পেঙ্গুইনদের দেখে শিকারী কুকুরগুলো শিকারের আশায় ক্ষেপে ওঠে, 'চেন্' ছিঁড়ে তাদের আক্রমণ করবার জন্যে ছটফট করে কিন্তু পেঙ্গুইনদের কোন ভয়-ডর নেই…তারা গম্ভীরচালে একপা একপা করে এগিয়ে আসতেই থাকে, ভাবটা যেন কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে, কোথা থেকে আসা হলো আপনাদের ?

খাদ্য মুখের কাছে এগিয়ে আসছে দেখে কুকুরগুলো উল্লাসে আরো জোরে চীৎকার করতে থাকে। ওট্‌স আর মায়ার্স, তাদের দলবল নিয়ে ছুটে না এলে, এই অদ্ভুত মিতালীর নিমেষে রক্তাক্ত অবসান ঘটতো।

হাট্ পয়েন্টের ঘর-সংসার গোছানো হয়ে গেলে, স্কট সমস্ত অভিযানের প্লান সহযাত্রীদের নিয়ে ঠিক করতে বসলেন।

দি গ্রেট্ হোয়াইট্ পাথ্

এডভেঞ্চারের ইতিহাসে ক্যাপটেন স্কটের নাম অমর হয়ে আছে এবং থাকবে কিন্তু আর একদিকে তাঁর নাম জগতের সাহিত্যেও থেকে যাবে। এই বিচিত্র মানুষটীর স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে নানাদিকে চরিত্রের এমন বিকাশ দেখা যায় যে তাঁকে আজকের নতুন পৃথিবীর একটা আদর্শ মানুষ বলে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি।

তিনি জীবন আরম্ভ করেন সৈনিক হিসাবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আদর্শ সৈনিকের মতন তিনি সমস্ত বিপদ-আপদের মধ্যে অবিচলিতভাবে তাঁর কর্ত্তব্য পালন করে গিয়েছেন, সৈনিকের মতনই তিনি সমস্ত আঘাতকে গ্রহণ করে সমস্ত আঘাতের ওপরে উঠেছেন। একান্ত সঙ্কটের মুহূর্ত্তে, মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও, তিনি ভীত হন নি, আর্ত্তনাদ করেন নি, নিজের কর্ত্তব্য বিন্দুমাত্র ভুলে যান নি। আবার যেখানে তিনি প্রতিদিনের মানুষ, সেখানে তাঁর ভদ্রতা, ভব্যতা, তাঁর কোমলতা, মায়ের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি, পত্নীর প্রতি অপরিসীম প্রেম, জাতির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মেরুঅভিযানে একদিকে দেখি কি কঠোর তাঁর প্রাণ, মৃত্যুকেও করেন উপেক্ষা, আবার আর একদিকে দেখি, কি কোমল সেই প্রাণ, কি অসীম সহানুভূতি-ভরা, সামান্য একটা কুকুরের মৃত্যুতে তাঁর সৈনিকের চোখে আসে জল, সামান্য একটা কুকুরকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে এক মুহূর্ত্তও হন না কুণ্ঠিত।

আবার সেই লোককেই দেখি, পরিচালক হিসাবে, দলপতি হিসাবে, কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে, নিখুঁত যন্ত্রের মত কাজ করে যেতে, সামান্যতম ত্রুটীও যে ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। একান্ত হিসেবী লোকের মতন কাজের সিকি-পয়সারও যে হিসেব মিলাতে চায়। সেই লোককে আবার দেখি, সাহিত্যিকের রূপে, কল্পনা-বিলাসীর রূপে, সৌন্দর্য্য-পিয়াসীর রূপে। দক্ষিণ-মেরুতে তিনি গিয়েছিলেন, লক্ষ্য ছিল তাঁর দক্ষিণ-মেরুতে পৌছনো···কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি পৃথিবীর যে অপরূপ নব-রূপ দেখলেন, সেখানকার আলো-বাতাস, সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্তে যে নতুন রূপের সন্ধান পেলেন, আকণ্ঠ ভরে সে-সৌন্দর্য্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সাহিত্যে তাকে অপরূপ ভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন। তোমরা বড় হয়ে তাঁর লেখা এই মেরু-অভিযানের ডায়েরী যখন পড়বে, তখন দেখবে সেই ডায়েরীর শুকণো ঘটনার বিবরণ আর বৈজ্ঞানিক তথ্যের নীরস পরিমিত বর্ণনার আশে-পাশে তাঁর সৌন্দর্য্য-পিয়াসী মনের অপরূপ সব সাহিত্যিক নিদর্শন···এই চির-তুষার-রাজ্যের যে অপরূপ রূপ দেখেছেন তা বিস্ময়করভাবে অতি অল্প কথায়, শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর মতন, শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের মতন তুলির এক আঁচড়ে অপরূপভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন······

এই পরিচ্ছেদের মাথার ওপরে যে কটা কথা আছে, তা স্কটেরই লেখা···এই মেরু-অভিযানের পথকে তিনি বলেছেন, দি গ্রেট হোয়াইট পাথ, The great white path and a green tent! দুটী কথায় সমগ্র অভিযানের একটা ছবি তিনি এঁকেছেন, অন্তহীন দীর্ঘ শুভ্র পথ আর সেই পথের ধারে একটা সবুজ তাঁবু!

সমস্ত অভিযানের এই হলো প্রতীক।

হাট্‌ পয়েন্টকে কেন্দ্র করে স্কটের সমগ্র অভিযানের যদি কোন জ্যামিতিক ছবি আঁকা যায়, তাহলে দেখবে সেটা অসংখ্য লাইনের একটা গোলকধাঁধা। কারণ দীর্ঘদিন ধরে, নানা পথে, নানা বার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁদের যাতায়াত করতে হয়েছে। সেইজন্যে এই অভিযানের কোন একটানা কাহিনী ইংরেজীতেও পাওয়া যায় না! প্রত্যেক বই-ই এই অভিযানের এক-একটা অংশের বর্ণনা করেছে।

এখানে তোমাদের বোঝবার সুবিধার জন্যে সমগ্র অভিযানের একটা সংক্ষিপ্ত খবর দিয়ে রাখছি।

১৯১১ সালের গোড়ার দিকে এই অভিযান হাট পয়েন্টে এসে নামলো। সেখানে থেকে স্কট কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তার একটা প্লান করলেন।

প্রথমে ঠিক হলো, শীতকাল যতক্ষণ না আসে, এখান থেকে দুটো দল প্রথমে বেরুবে। প্রথম দলের কাজ হবে, বেরিয়ারের ওপর যতটা আগিয়ে পারা যায় একটা বড় ডিপো তৈরী করা, সেই ডিপোতে আসল মেরু-অভিযানের জন্যে যা যা দরকার সমস্ত এনে মজুত করা। এই ডিপোর নাম হলো Safety Camp পনির পিঠে সব জিনিস হাট্‌ পয়েন্ট থেকে এনে সেফ্‌টি ক্যাম্পে জমা করতে হবে। অভিযানের এই অংশকে বলে Depot Journey, আমরা বলবো ডিপো অভিযান। দ্বিতীয় দল যাবে, হাট্‌ পয়েন্ট থেকে পশ্চিম অঞ্চলের পাহাড়ের দিকে, ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে। এই অভিযানের নাম হলো ভূতত্ত্ব অভিযান। বাকি লোক হাট্‌ পয়েন্টে থেকেই নানা বিষয়ে গবেষণা করবেন।

প্রথম শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উইলসন একটা দল নিয়ে বেরুলেন, পেঙ্গুইন-পাখীদের আড্ডার দিকে, প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে। এই অভিযানকে বলে শীতের অভিযান, উইনটার জার্নি।

সেই সঙ্গে চলতে থাকে, আসল দক্ষিণ-মেরু-অভিযানের আয়োজন। শীতের মাঝামাঝি এই অভিযান সুরু হয়। এই অভিযানে দলের অধিকাংশই যোগদান করেন, একটা হয় মোটর স্লেজ পার্টি, ব্যারিয়ার ছাড়িয়ে এই পার্টি বেশীদূর আর এগুতে পারলো না, যন্ত্রের গোলমালের জন্যে ফিরতে বাধ্য হলো। দ্বিতীয় দল হলো কুকুরে-টানা-স্লেজ-পার্টি, বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ারের তলা থেকেই এই দল ফিরতে বাধ্য হলো। বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ার থেকে বারো জন দক্ষিণ-মেরুর দিকে এগিয়ে চল্লো। এই গ্লেসিয়ারের ওপর-অঞ্চল থেকে এ্যাটকিন্‌সনের অধীনে আরো চারজন ফিরে আসতে বাধ্য হলো। এদের নাম হলো প্রথম রিটার্নিং পার্টি। দুসপ্তাহ পরে আরো কিছুদূর এগিয়ে লেফ্‌টেনান্ট ইভান্‌সের অধীনে আরো তিনজন ফিরতে বাধ্য হলো, এদের বলে দ্বিতীয় রিটার্নিং পার্টি। বাকি পড়ে রইলো পাঁচজন লোক স্কট, উইলসন, বোয়ার্স, ওট্‌স আর সীম্যান্। এঁরাই সর্ব্বশেষে এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ-মেরু-বিজয়ে।

ডিপো অভিযান

স্কট তাঁর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, শীত আসবার আগেই হাট পয়েন্ট থেকে আরো ভেতরে কোন নিরাপদ জায়গায় প্রথম একটা বড় রকমের ডিপো গড়ে তুলতে হবে, সেই ডিপোতে মজুত থাকবে এক টন মতন খাদ্য আর অন্য সব দরকারী জিনিস। হাট পয়েন্ট যেখানে গড়ে তোলা হয়েছিল, সে-জায়গাটা অভিযানের দিক থেকে নিরাপদ নয়, কারণ তার চারদিকে যে-সব বরফ পড়েছিল, শীতের সময় সে-বরফ ভেঙ্গে গিয়ে মূল দক্ষিণ-মেরুর ভূমি-খণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সেইজন্যে মূল দক্ষিণ-মেরুর অচল ভূমির ওপর একটা বড় রকমের ডিপো তৈরী করা দরকার, যেখান থেকে মাটী আর সরে যাবে না। সেইজন্যেই এই ডিপোর নাম দেওয়া হয়, Safety Camp*. হাট পয়েন্ট থেকে ২১ মাইল আরো দক্ষিণ দিকে হলো এই Safety Camp.

সেফ্‌টি ক্যাম্পে জিনিস-পত্র নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়ায়-টানা ৮টা শ্লেজ আর কুকুরে-টানা ২টো শ্লেজ তৈরী করা হলো। স্কট সঙ্গে এগারোজন লোক, আর শ্লেজ টানবার জন্যে ৮টা ঘোড়া আর ২৬টা কুকুর নিয়ে সেফ্‌টী ক্যাম্প গড়ে তোলবার জন্যে যাত্রা করলেন। মেরুর নিদারুণ শীত পড়বার আগে, কুকুর আর ঘোড়াগুলোকে মেরু-প্রকৃতির সঙ্গে বনিয়ে নিতে হবে; স্কটের মনে নিদারুণ শঙ্কা, সেই নিষ্করুণ মেরু-অঞ্চলের প্রচণ্ড শীত আর তুষার-ঝঞ্ঝা যদি এরা সহ্য করতে না পারে,

*ম্যাপ দেখো

তাহলে হয়ত সমস্ত অভিযানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিশিদিন ওট্‌সের মনেও সেই শঙ্কা, কারণ তাঁরই ওপর এই জন্তুদের সমস্ত দায়িত্ব, মা যেমন রুগ্ন ছেলের দিকে অতন্দ্র চেয়ে থাকে ওট্‌স্‌ তেমনি চব্বিশ ঘণ্টা এই প্রাণীগুলিকে আগলে থাকেন, তাদের একটু কিছু হলেই ওট্‌স্‌ ওষুধ নিয়ে সেবা করতে বসেন। তাই হাট পয়েণ্ট থেকে যখন মেরু-তুষারের ওপর দিয়ে প্রথম তাঁরা সেফ্‌টী ক্যাম্প-অভিযানে বেরুলেন, ওটস্‌ দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, যদি একটা ঘোড়া বরফের গর্ত্তের ভেতর পড়ে যায়, বসে বসে কাঁদা ছাড়া আমার আর কোন পথ থাকবে না!

সত্যিই, এই চতুষ্পদ-সঙ্গীদের জন্যে তাঁদের সব দিক থেকেই কাঁদতে হয়েছিল। এই সেফ্‌টী-ক্যাম্প অভিযানেই সে-ট্রাজেডী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাট পয়েণ্ট থেকে বেশীদূর না এগুতেই স্কট বুঝলেন, যে-আশায় তিনি কুকুরদের সঙ্গে এই পনি-ঘোড়াদের এনেছিলেন, সে-আশা বোধ-হয় তাঁর ব্যর্থ হবে। সব জায়গায় বরফ সমান কঠিন নয়, মাঝে মাঝে হঠাৎ খানিকটা জায়গায় অগঠিত নরম বরফ, সেখানে এসে ঘোড়াগুলো আর চলতে পারে না, বরফের ভেতর তাদের পা ডুবে যায়। বহু কষ্টে এবং বহু সময় নষ্ট করে সেই নরম বরফের ফাঁদ থেকে তাদের উদ্ধার করে খুব ধীরে ধীরে সন্তর্পণে এগুতে হয়। তা ছাড়া, স্কট দেখলেন, আর এক বিপদ ঘটছে, যার জন্যে ঘোড়াগুলো একেবারেই জোরে চলতে পারছে না। তখন গ্রীষ্মকাল, মেরুর ধূলি-হীন আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো শাদা বরফের ওপর সোজা পড়ার দরুণ, সমস্ত পথ সূর্য্যালোকিত কাঁচের মতন ঝিকমিক করছে, বরফে প্রতিফলিত হয়ে সেই সূর্য্যের আলো ঘোড়াদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। অল্প পথ যেতেই তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে। স্কট শঙ্কিত হয়ে পড়েন, এই তো সবে সুরু,

এখনো দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ পথ সামনে পড়ে। এই প্রাণীদের ওপর নির্ভর করেই তাঁকে মেরুর দিকে তাঁবু ফেলে ফেলে এগুতে হবে, তাদের কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে কিম্বা মরে যায়, তাহলে সমস্ত অভিযানেরই ক্ষতি হবে। তাই প্রথম দিন তিনি বেশীদূর আর এগুতে পারলেন না, মাত্র সাত মাইল গিয়ে তাঁকে তাঁবু ফেলতে হলো।

তাঁবুতে সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরামর্শের পর ঠিক করলেন, এখন আর দিনের বেলায় হাঁটা হবে না, রাত্রিতে যখন সূর্য্যের আলো স্তিমিত হয়ে থাকবে, সেই নিশীথসূর্য্যের স্তিমিত আলোয় সারা রাত্রি তাঁরা হাঁটবেন, তাতে ঘোড়াগুলোর কম পরিশ্রম হবে এবং গতিবেগও বাড়তে পারে।

দলপতির সেই সিদ্ধান্ত সকলেই মেনে নিলেন। রাত ন'টা বাজতেই স্কট হুইসিল্ বাজিয়ে যাত্রার আদেশ দিলেন। তখন যে-যার ঘুমোবার ব্যাগে চোখ বুঁজে পড়ে ছিল, তক্ষুণি ব্যাগ ফেলে প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালো, বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, সে-হাওয়ায় হাতের আঙুল অবশ হয়ে আসে, তারই মধ্যে ঘোড়া, কুকুর, শ্লেজ সব ঠিক করে আধঘণ্টার মধ্যে যাবার জন্যে সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলেন। রাত সাড়ে ন'টার সময় ব্রেকফাষ্ট, বরফ গলিয়ে জল ক'রে তাড়াতাড়ি কোকো তৈরী হলো···কোকো আর বিস্কুট···সেই ব্রেকফাষ্ট···

ব্রেকফাষ্ট সেরেই তাঁরা তাঁবু তুলে রওয়ানা হলেন···সকাল আট-টায় আবার তাঁবু···

এই ভাবে একুশ মাইল পথ এসে সেফ্‌টী ক্যাম্প গড়ে তোলা হলো। সেখান থেকে আরো ষাট মাইল দক্ষিণে স্কট আর একটা ডিপো গড়ে তুল্লেন, এই ডিপোতেও প্রায় আর একটন খাদ্য আর

জিনিস-পত্র এনে মজুত করে রাখা হলো। এই ডিপোর নাম ওয়ান্-টন-ডিপো।

এই ওয়ান্-টন-ডিপোর কাছেই দক্ষিণ-মেরু থেকে ফেরবার পথে ঘটে অভিযানের চরম ট্রাজেডী···

এই দুটো ডিপো গড়ে তুলতে, স্কটকে সেফ্‌টী ক্যাম্প থেকে হাট পয়েন্টে ৬ বার যাতায়াত করতে হয়েছে, ওয়ান্-টন-ডিপো থেকে সেফ্‌টী ক্যাম্পে পনেরো বার যাতায়াত করতে হয়েছে···

এই ভাবে দেখতে দেখতে এসে গেল শীতকাল···

হাট পয়েন্ট থেকে সরে কেপ্ ইভান্‌স্-এর ওপর গড়ে তোলেন শীতের আশ্রয়···সেখানে নানারকমের গবেষণার ভেতর দিয়ে তাঁরা অপেক্ষা করে থাকেন শীতাবসানেব জন্যে।

মেরুর প্রচণ্ড শীতের সেই বন্দীশালায় তাঁরা স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে থাকেন, কিন্তু সেই নিশ্চল অবরুদ্ধ জীবনের ভেতরেই তাঁবা উদ্ভাবন করেন নানারকমের কাজ···সৃষ্টি কবেন নব নব উৎসাহ, উদ্দীপনা, সময় কাটাবার নানারকমের কাজ···

পদে পদে রয়, মৃত্যু আর ভয়

ডিপো অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে স্কট বুঝতে পারেন, প্রচণ্ড বাধা আর বিঘ্নের সঙ্গে পদে পদে সংগ্রাম করে তাঁকে এগুতে হবে। তিনি সেইভাবেই গোড়া থেকে তাঁর মনকে প্রস্তুত করেন।

আজ আমরা এই অভিযানের সমগ্র ইতিহাস জানি। সে-ইতিহাসে দেখি, স্কট পদে পদে বাধা আর বিঘ্ন পেয়েছেন, পদে পদে দেখেছেন মৃত্যুর ছায়া কিন্তু সেই সঙ্গে দেখি, সমস্ত বাধা আর বিঘ্নকে তুচ্ছ করে একটা লোক অম্লান মুখে এগিয়ে চলেছে···প্রকৃত সৈনিকের মতন, প্রকৃত খেলোয়াড়ের মতন প্রত্যেকটি বিপর্য্যয়কে, প্রত্যেকটি বাধাকে খেলার অঙ্গ বলেই সহজে স্বীকার করে নিয়েছেন। যেদিনই কোন বৃহৎ বিপদের সামনে পড়েছেন এবং অনবরতই তা পড়েছেন, সেদিনই তাঁর ডায়েরীতে দেখি, দীর্ঘশ্বাসের বদলে, হা-হুতাশের বদলে, নব-উৎসাহ, নব-উদ্দীপনা···এই সব বাধাবিঘ্ন আর বিপদের সম্পর্কে তার ডায়েরীতে একজায়গায় লিখেছেন, "I suppose this is the reason which makes the game so well worth playing".

"এই সব বিপদ আর বিঘ্ন আছে বলেই এই খেলা খেলতে এত সাধ যায়।"

ডিপো অভিযানের স্থরু থেকেই এই বিপদ আর বাধার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থরু হয়। তার সূত্রপাত হয় ঘোড়া আর কুকুরদের নিয়ে। আমুনসেন দক্ষিণ মেরু-অভিযানে ঘোড়াদের একেবারে বাদ দিয়েছিলেন, স্কট ঘোড়াদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেই বহু কষ্টে

তাদের সংগ্রহ করে সঙ্গে এনেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশ তিনি বুঝলেন, সেখানে তিনি মহাভুল করেছেন। আমুনসেন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বহু কুকুর, তারা প্রত্যেকেই তুষারে শ্লেজ-টানার কাজে অভ্যস্ত। স্কট যে অল্পসংখ্যক কুকুর সঙ্গে এনেছিলেন, তারা শ্লেজ টানতে জানলেও, তারা আসলে শিকারী কুকুর, নেকড়েরই জাত-ভাই। অসীম ধৈর্য্যে তিনি তাদের শিক্ষিত করে তুললেও, তারা তাদেব হিংস্র বুনো স্বভাব তাদের সঙ্গেই নিয়ে এসেছিল।

সাইবেরিয়ার তুষার-ভূমিতে বুনো লোকদের সঙ্গে তাবা নেকড়ে শীকার করে বেড়িয়েছে। জাহাজে বা তাঁবুতে তারা একরকম চুপচাপ করেই ছিল, হয়ত অজানা পরিবেশের ভয়ে। ডিপো অভিযানের পথে যেই তাদের পরিচিত তুষার-ক্ষেত্রের মধ্যে তারা এসে দাঁড়ালো, তাদের ভেতরকার সেই হিংস্র প্রবৃত্তি আপনা থেকে জেগে উঠলো, নেকড়ের মতন ভয়ংকর হয়ে উঠলো, ঘোড়াদেব দেখে তাদের আক্রমণ করবাব জন্যে একসঙ্গে চীৎকাব করে লাফিয়ে উঠলো। কিছুতেই আর তখন তাদের রাশ টেনে রাখা যায় না। একটু ছাড়া পেলেই তারা ঘোড়াগুলোকে যেন টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এই কুকুবদের মধ্যে আবার ছুটি কুকুর ছিল, ভূতপূর্ব্ব বুনো মনিব যাদের শিখিয়েছিল, নতুন লোক বা প্রাণী দেখলেই আক্রমণ করতে। স্কট সে-সংবাদ জানতেন না, তিনি এই কুকুর ছুটির পাশ দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছিলেন, একটা কুকুর সেই বাঁধা অবস্থার ভেতর থেকে তাঁর পায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে সজোরে কামড়ে দেয়। পায়ে মোটা রবারের জুতো থাকাতে স্কট কোনরকমে রক্ষা পেয়ে গেলেন।

স্কট বুঝলেন, এই কুকুরদের নিয়েও তাঁকে বিপন্ন হতে হবে…অথচ

নিরুপায়, এদের নিয়েই কাজ করতে হবে। সেই নিস্তব্ধ মেরুপ্রান্তর ক্ষণে ক্ষণে তাদের মিলিত বীভৎস চীৎকারে কেঁপে ওঠে, আবার কি মনে করে পরক্ষণেই তারা শান্ত হয়ে যায়…

ওয়ান্-টন-ক্যাম্প থেকে স্কট দলবল নিয়ে সেফ্‌টি ক্যাম্পে ফিরছেন, ক্যাম্প তখনো ১২ মাইল দূরে, হঠাৎ যে তুটো শ্লেজ নিয়ে তাঁরা ফিরছিলেন, তাদের মাঝের কুকুরগুলো বরফের ভেতর ডুবে গেল, তাদের টানে তুটো করে আগু-পিছু আর যে সব কুকুর ছিল, তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল, একমাত্র ওসমান বলে একটা বড় কুকুর কোনরকমে বরফ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কট এবং তাঁর সঙ্গীরা তক্ষুনি ওসমানের সাহায্যে না লেগে পড়লে শ্লেজশুদ্ধু ওসমানও ডুবে চলে যেতো। স্কট দেখেন, সামনেই বরফের একটা সুগভীর ফাটল, কুকুরগুলো তখনো খানিকটা নীচে শ্লেজের ষ্ট্রাপের সঙ্গে ঝুলছে, ওসমান যদি না আটকাতো তাহলে তারা ততক্ষণে গভীরে তলিয়ে যেতো। সৌভাগ্যের বিষয়, শ্লেজটাও ফাটলের মুখে আটকে গিয়েছিল। তখন সকলে মিলে কুকুরগুলোকে একে একে ভেতর থেকে টেনে ওপরে তোলা হলো—কিন্তু গুণে দেখা গেল, ১৩টা কুকুরের জায়গায় ১১টাকে মাত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আর বাকি তুটো ?

স্কট তাড়াতাড়ি তাঁর দূরবীণ নিয়ে সেই তুষার ফাটলের ভেতর দিয়ে দেখেন প্রায় ৬৫ ফিট নীচে এক ফালি বরফের চাঁই সেতুর মতন রয়েছে, কুকুর তুটো সেই বরফের চাঁই-এর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তলায় অগাধ সমুদ্র। Killer-whaleরা খবর পায়নি তাই, নইলে ততক্ষণে কুকুর তুটোর চিহ্ন থাকতো না।

কিন্তু সেই তুষার ফাটলের ভেতর ৬৫ ফিট নীচে সেই কুকুর

দুটোকে উদ্ধার করবে কে? দেরী করবার সময় নেই কিন্তু সেই গভীরে নামা মানেও জীবনকে বিপন্ন করা। এসব ক্ষেত্রে দলপতি হিসাবে স্কট সিদ্ধান্ত করতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করতেন না, এই জাতীয় মারাত্মক দায়িত্ব এলে দলপতি হিসাবে তিনি নিজেই গ্রহণ করতেন, দলের কারুর কোন অনুযোগ বা আপত্তি শুনতেন না। তাছাড়া, সেই মূক প্রাণীদের জন্যে সেই দুর্দ্ধর্ষ দলপতির অন্তর যেমনভাবে সহজে দুলে উঠতো, তেমন আর কারুর উঠতো না। স্কট তক্ষুনি আলপাইন দড়ি আনিয়ে নিজের কোমরে বাঁধলেন···ওপর থেকে সেই দড়ি ধরে তাঁকে ফাটলে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

ধীরে ধীরে তিনি নীচে সেই তুষার-সেতুর ওপর নামলেন। নিজের কোমর থেকে দড়ি খুলে এক-একটা কুকুরকে বাঁধলেন। নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন সেই তুষার-সেতুর ওপর, মরণের গহ্বরে। কুকুর দুটো উপরে উঠে গেল, কিন্তু তাঁর জন্যে আর দড়ি নামে না! কি ব্যাপার?

কুকুর দুটো ছাড়া অবস্থায় ওপরে উঠেই অন্য বাঁধা কুকুরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন অগত্যা স্কটকে ফেলে লোকদের ছুটতে হয় কুকুর দুটোকে সামলানোর জন্যে। কুকুর দুটোকে সামলে তারা আবার দড়ি নামিয়ে দেয়। স্কট ওপরে উঠে আসেন। সেই নির্জ্জন জনহীন প্রান্তরে পদে পদে এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের মনের চেহারা আলাদা হয়ে যায়।

এই ঘটনা এবং অনুরূপ আরো ঘটনা থেকে স্কট ক্রমশ কুকুরদের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। কুকুরদের সম্পর্কে তাঁর ডায়রীতে অনেক দামী দামী অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখছেন, এই জনহীন চিহ্নহীন তুষার-মরুভূমির

নিদারুণ একঘেয়েমীর পথে, আমি দেখেছি, কুকুররা স্বভাবতই অনুপযুক্ত। কুকুরের মন, হয় খাওয়ার দিকে থাকবে, নয় ঘুমোবে, না হয় অন্য যা হোক একটা কিছু তার আগ্রহের বিষয় তার সামনে থাকা চাই। দিনের পর দিন এই একই রকমের পথের ভেতর দিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে মারাত্মক। মেরুতে পথের কোন নিশানা নেই, পথে কোন চিহ্ন নেই, আশেপাশে সামনে কোথাও কোন লক্ষ্য নেই। মানুষের মতনই কুকুর চায় একটা জ্যান্ত লক্ষ্য, একটা জীবন্ত আগ্রহ। মানুষ ভবিষ্যতের বৈচিত্র্যের আশায় বর্ত্তমানের একঘেয়েমীকে সহ্য করতে পারে। কুকুর তা পারে না।"

স্কটের দুর্ভাগ্য, যে কুকুর আর পনি ঘোড়াদের এত কষ্ট ক'রে সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে এলেন, তারাই তাঁর সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ হয়ে উঠলো। কিন্তু এই হতাশার মধ্যে একটা জিনিষ তাঁকে উল্লসিত করে রাখলো, তাঁর সহযাত্রীরূপে যে ক'টি মানুষকে এনেছিলেন, তাদের কারুর সম্পর্কে এতটুকু অভিযোগ করবার তাঁর কিছু ছিল না।

ঘুমের মধ্যে ভেসে চলে তাঁবু

সেফ্‌টি ক্যাম্পে ফিরে এসে স্কট দেখলেন, লেফটেন্যাণ্ট ইভান্‌সের নায়কত্বে যে-দলকে পাঠিয়েছিলেন তুষার-প্রাচীরের উপকূল-অংশ পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে, তাঁরা ফিরে এসেছেন কিন্তু তাঁরা তিনটি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিলেন, দুটি ঘোড়াকে তুষার-গহ্বরে রেখে আসতে হয়েছে, ফিরেছে মাত্র একটি।

সেফ্‌টী ক্যাম্প থেকে তাঁরা তাড়াতাড়ি ফিরলেন হাট্ পয়েণ্টের দিকে, কারণ দ্রুত শীত নেমে আসছে, তার আগেই হাট্ পয়েণ্ট থেকে সরে কেপ্ ইভান্‌স্-এ শীতের আস্তানায় গিয়ে উঠতে হবে। ব্যারিয়ার আর হাট্ পয়েণ্টের মাঝখানে মাত্র পাঁচ মাইল সমুদ্র-তুষার, এই পাঁচ মাইল পেরিয়ে শীতের আস্তানায় উঠতে হবে। ইতিমধ্যে সুরু হয়ে গিয়েছে ব্লিজার্ড, মেরুর তুষার-ঝঞ্ঝা, এই ঝঞ্ঝার এরকম দুরন্ত বেগ যে যে-কোন মুহূর্ত্তে সেই পাঁচ মাইল ভাসমান সমুদ্র-তুষার ফেটে যেতে পারে এবং ঝড়ের বেগে তাড়িত হয়ে সমুদ্রের ভেতরে ভেসে চলে যেতে পারে। তাই যত শিগ্‌গীর সম্ভব হাট্ পয়েণ্ট ত্যাগ করে রওয়ানা হতে হবে। আবহাওয়া যন্ত্রে তখন দেখা গেল, যে ডিগ্রীতে জল জমে তুষার হয়, আবহাওয়া তারও ৪০ ডিগ্রী নীচে নেমে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি শ্লেজে মালপত্র তুলে মানুষ, ঘোড়া আর কুকুর চল্লো সেই পাঁচ মাইল সমুদ্র-তুষার পেরিয়ে কেপ্ ইভান্‌স্-এর শীতের আস্তানার দিকে।

কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই বিপদের সিগ্‌ন্যাল স্পষ্ট হয়ে

উঠলো, সঙ্গে যে-সব ঘোড়া ছিল তাদের মধ্যে Weary Willie হঠাৎ পা দুমড়ে পড়ে গেল। এই অভিযানে যে-সব ঘোড়া আর কুকুর ছিল, তাদের প্রত্যেকের একটা করে আলাদা নাম দেওয়া হয়। এই উইলি ঘোড়াটা সুরু থেকেই গোলমাল করতে থাকে, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তাই নামের সঙ্গে একটা বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হয়, Weary Willie, ক্লান্ত উইলি।

এরই মধ্যে উইলি আরো ২।৩ বার এই রকম পা দুমড়ে পড়ে গিয়েছে, আবার উঠেছে। কিন্তু এবার আর উঠতে পারলো না। পড়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার দেহ অসাড় হয়ে গেল। অপেক্ষা করে থাকবার উপায় নেই, সামনে মাত্র এই পাঁচমাইল তুষার-পথ, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে এই পাঁচমাইলের মধ্যে বরফ ফেটে গিয়ে মহা-আতঙ্ক দেখা দিতে পারে। অথচ ঘোড়াটাকে একটা চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে ফেলে যেতে স্কটের মন চাইলো না। তিনি, ওটস্ আর গ্রাণ থেকে গেলেন, বাকি দলকে এগিয়ে চলবার আদেশ দিলেন। কিন্তু স্কটের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, ক্লান্ত উইলি আর উঠলো না।

ওধারে কুকুরে-টানা স্লেজের দল আগে গিয়ে শক্ত তুষার-ভূমিতে পৌঁছল কিন্তু ঘোড়ার দল কিছুতেই এগোতে পারলো না। তিনমাইল এগোতে না এগোতে পায়ের তলায় সমুদ্র-তুষারে একটার পর একটা ফাটল দেখা দিতে লাগলো। মানুষের দেখাদেখি ঘোড়াগুলো লাফিয়ে সেই ফাটল পার হয়ে ছুটতে লাগলো। কিন্তু শেষ বরাবর একটা ফাটল লাফিয়ে ওধারে আসতেই, দলের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। তাঁরা স্পষ্ট দেখলেন, সেই তুষার-খণ্ড অতি দ্রুত সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ফেরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ফাটলের

মুখ বাড়বার আগেই ফিরতেই হবে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলোও যেন মরিয়া হয়ে উঠলো এবং সেই ক্রমবর্দ্ধমান ফাটলের মুখ লাফিয়ে এধারে এসে পড়লো। আর কয়েক মুহূর্ত্ত দেরী হলে অসহায় ভাবে সকলকে সেই ভাসমান তুষারখণ্ডের ওপর সমুদ্রের জলে ভেসে চলে যেতে এবং সেখানে Killer-whale-দের খাদ্য রূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হতো।

এই মহাবিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তাঁরা যখন শীতের ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হলেন, তখন মানুষ, ঘোড়া, কুকুর সবাই একান্ত পরিশ্রান্ত। কোনরকমে তাঁবু ফেলে সেদিনের মতন যে-যার sleeping bag-এ শুয়ে পড়লো। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ক্লান্তিতে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ সেই রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে বোয়ার্স সচকিত হয়ে জেগে উঠলেন। তিনি আর কয়েকজন সঙ্গী একটা আলাদা তাঁবুতে ঘুমুচ্ছিলেন। কিসের যেন গুরুগম্ভীর শব্দে বোয়ার্সের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেই গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে কিছুই বুঝতে পারেন না, শব্দ তখনও হচ্ছে···হঠাৎ বোয়ার্স বুঝতে পারলেন, এ বরফ ফাটার শব্দ···যে বরফের ওপর তাঁদের তাঁবু সেই বরফ ফাটছে···সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, বরফ সরে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভেতর তাঁরাও সরে চলেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁবুর সকলকে জাগালেন, বাইরে উঁকি মেরে দেখেন, তাঁবুর সঙ্গে যে-ঘোড়াটা বাঁধা ছিল, চোখের সামনে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল, সমস্ত তাঁবুকে ঘিরে সমুদ্রের জল আর সেই জলের ভেতর দিয়ে তাঁরা নিঃশব্দে মৃত্যু ও সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ওধারে সামনে অন্য তাঁবুতে তাঁদের সঙ্গীরা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন, এই নিশীথ-আতঙ্কের কোন খবরই তাঁরা জানেন না।

এই মহাবিপদের মধ্যে গ্রাণ বল্লেন, কোন রকমে আমি বরফের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁবুর দিকে যাই, তাঁবুর সকলকে খবর দি, নইলে আমাদের নিজেদের চেষ্টায় বাঁচবার কোন আশা নেই।

কিন্তু লাফিয়ে যাবেন কোথায়? মেরুর সেই নিশীথ রাত্রির রহস্যময় আলোয় কালো কালো মাথা তুলে চারদিক থেকে ছুটে আসছে Killer whale-এর দল, প্রাণ তুচ্ছ করে গ্রাণ কোন রকমে একটা লাঠির ওপর নির্ভর করে এক তুষার-খণ্ড থেকে লাফিয়ে আর এক তুষার-খণ্ডে গিয়ে পড়েন। এইভাবে অসাধ্য-সাধনের পর গ্রাণ হাঁপাতে হাঁপাতে স্কটের তাঁবুতে গিয়ে স্কটকে ঘুম থেকে তুল্লেন।

তক্ষুণি স্কট বাকি সঙ্গীদের নিয়ে আলপাইন দড়ি আর নানারকমের উদ্ধারের যন্ত্র নিয়ে ছুটলেন এবং সেই রাত্রিতে নির্দয় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে যেভাবে সেই ভাসমান জীবগুলিকে উদ্ধার করেন, তাকে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ বলা যেতে পারে। আল্‌পাইন দড়ির সাহায্যে তাঁরা কোন রকমে মানুষগুলিকে উদ্ধার করলেন কিন্তু দুটী ঘোড়া তখন আর একটা তুষার-খণ্ডে অসহায়ভাবে সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছিল। স্কট তাদেরও উদ্ধার করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। ওটস্ আর বোয়ার্স একটা ছোট নৌকো নিয়ে সেই ভাসমান তুষার খণ্ডের দিকে এগিয়ে চল্লেন।

তুষার-খণ্ডের কাছে গিয়ে দেখেন, চারদিকে কীলার-হোয়েলদের দল মাথা তুলে তুলে নাচছে, বন্দুকের শব্দ করতে তারা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কোন রকমে একটা ঘোড়াকে বোটে তুল্লেন, কিন্তু দ্বিতীয় ঘোড়াটা একটা ফাটলের মধ্যে পড়ে গেল। কিছুতেই আর তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, হয়ত ইতিমধ্যেই জলের তলা থেকে হোয়েলরা

তার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। তার চীৎকারে মেরু-রাত্রির মহা-নীরবতা যেন আর্তনাদ করে ওঠে। ওট্‌স্ বুঝলেন, তাকে মেরে ফেলাই এখন তার ওপর দয়া দেখানো হবে। একটা বন্দুকের গুলির শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটির আর্তনাদও থেমে গেল। বাকি ঘোড়াটিকে নিয়ে হোয়েলদের গুপ্ত-আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে কোন রকমে ওট্‌স আর বোয়ার্স ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যেই সাতটা ঘোড়া এইভাবে দল ছেড়ে চলে গিয়েছে, রাত্রিতে ডায়েরী লিখতে বসে স্কট নিজের অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন···

অন্তরে অতি-সংগোপনে শীতের দিনের কুয়াশার মতন ছেয়ে আসে এক আতঙ্কের ছায়া কিন্তু বাইরে কোথাও তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

দলের লোকেরা দলপতির দিকে চেয়ে দেখেন, তাঁর মুখে প্রশান্ত হাসি, যেন সমস্ত অভিযান একান্ত নিরাপদে এগিয়ে চলেছে···

অন্য আর একটা রাস্তা দিয়ে, ঘুরে ফিরে, তিনদিন লাগলো হাট পয়েন্ট থেকে সমস্ত মাল পত্র এনে শীতের আস্তানা গড়ে তুলতে।

টেরানোভা ইতিমধ্যে গ্রেট আইস্ ব্যারিয়ার ধরে Bay of Whales পর্য্যন্ত তটভূমি পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে সে নিউজীল্যাণ্ডের দিকে ফিরে গেল, ডাক আনবার জন্যে। টেরানোভা থেকে ক্যাম্পবেল শীতের আস্তানায় স্কটের কাছে একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠি খুলে স্কট দেখেন, ক্যাম্পবেল লিখছেন, Bay of whalesএর তটভূমিতে দেখলাম আমুনসেনের তাঁবু, নরওয়ের পতাকা উড়ছে তাঁবুর মাথায়···

সেই সংক্ষিপ্ত সংবাদের ভেতর স্কট বুঝতে পারলেন, যে-আশঙ্কাকে

এতদিন মনের সংগোপনে চাপা দিয়ে রেখেছেন, সে আজ সত্য হয়ে তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। তিনি বুঝলেন, তাঁরই মতন আমুনসেন শীতের জন্যে Bay of whalesএ তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করছেন, শীত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও দক্ষিণ-মেরুর দিকে যাত্রা করবেন।

রাত্রিতে ম্যাপ খুলে অঙ্ক কষে দেখেন, আমুনসেন যেখানে তাঁবু ফেলেছেন, সেখান থেকে দক্ষিণ মেরু ৮৩০ মাইল দূরে, তিনি যেখানে তাঁবু ফেলেছেন সেখান থেকে দক্ষিণ মেরু ৯০০ মাইল দূরে, অর্থাৎ আমুনসেনের চেয়ে ৭০ মাইল বেশী পথ তাঁকে যেতে হবে।

সামনে মেরুর শীতের দিবস-হীন চির-রাত্রি···এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর চির-রাত্রির রাজ্য···সূর্য্যহীন সেই বিচিত্র হিমকণ্টকিত অন্ধকারে তাঁবুতে বসে শুধু অপেক্ষা করে থাকা। এই অপেক্ষা-করে-থাকার মধ্যে গোপন কাঁটার মতন একটা দুশ্চিন্তা স্কটের মনে অষ্ট-প্রহর বিঁধতে থাকে, আমুনসেন কি তাঁর আগেই অভিযানে বেরিয়ে পড়বেন? সকল দিক দিয়ে ভেবে দেখেন, তার সম্ভাবনাই বেশী। আমুনসেন সঙ্গে কোন ঘোড়া আনেন নি, ঘোড়ার বদলে এনেছেন বহু কুকুর, প্রত্যেক কুকুরটিই মেরু-তুষারে শ্লেজ-টানাতে অভ্যস্ত···তাছাড়া, আমুনসেনের আর এক সুবিধা হবে, যে-শীতের মধ্যে ঘোড়ারা চলতে পারে না, কুকুররা সে-আবহাওয়ায় চলতে অভ্যস্ত, তাই শীত কমতে না কমতেই আমুনসেন হয়ত কুকুরদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন, স্কটকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে শীতের আবহাওয়া পুরোপুরি কেটে যাওয়া পর্য্যন্ত, নইলে ঘোড়ারা চলতে পারবে না। তাছাড়া, তাঁর ঘোড়াদের অবস্থা দেখে তিনি আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, ইতিমধ্যেই আটটী ঘোড়া মরে গিয়েছে, বাকি যে ক'টী ঘোড়া আছে, তারা যে কোন কারণে হোক্ দিন দিন যেন

শুকিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তাদের খাদ্যে কিছু গোলমাল হচ্ছে। ওট্‌স্ আহার-নিদ্রা ভুলে ঘোড়াগুলোর সেবায় অষ্টপ্রহর আত্ম-নিয়োগ করলেন। ক্যাম্পের লোকেরা ঠাট্টা করে বলতো, ওট্‌সের ঘোড়া এবার ডার্বি জিতবে!

এই শীতের ক'টা মাস তাঁরা সকলে মিলে, ঘোড়া কুকুর আর মানুষ, একটা বৃহৎ বাংলো ধরণের হাটের ভেতর আবদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য হলেন কিন্তু সেই আবদ্ধ জীবনের ভেতর তাঁরা নানারকম উপায় উদ্ভাবন করেন, যাতে দেহ, মন আর মস্তিষ্ক অলস না হয়ে যায়।

পঞ্চাশ ফিট লম্বা আর পঁচিশ ফিট চওড়া একটা বড় ঘর তৈরী করা হয়, তার মাঝ বরাবর বাক্‌সো আর প্যাকিং কেস থাকের পর থাক সাজিয়ে সেটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। এই প্যাকিং কেসের পাঁচিলের একধারে থাকতেন অফিসররা আর বৈজ্ঞানিকেরা। সেই আয়তনের ভেতরই প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক খানিকটা করে জায়গা আলাদা করে নিয়ে তাঁদের ল্যাবরেটরী গড়ে তোলেন। এইভাবে ফটোগ্রাফার পন্‌টিঙ পর্দ্দা ফেলে এরই মধ্যে ছোটখাটো একটা ডার্ক রুমও করে নিয়েছিলেন।

২৩শে এপ্রিল নাগাদ উত্তর আকাশ থেকে সূর্য্যের আলোর শেষতম রেখা মুছে গেল, নেমে এলো আলোহীন অবিচ্ছেদ রাত্রির একঘেয়ে অন্ধকার। সেই সঙ্গে একটু একটু করে আবহাওয়াও বদলাতে লাগলো। দেখতে দেখতে এলো ব্লিজার্ড আর তুষার ঝঞ্ঝার দিন। দু'তিনজন ছাড়া মেরুর সেই তুষার-ঝঞ্ঝার সঙ্গে কারুরই পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল না। তাই তাঁরা প্রত্যেকে সেই ঝড়কে গা-সওয়া করে নেবার জন্যে তারই মধ্যে নানারকমের ব্যায়াম সুরু করে দিলেন। ওটস্

ঝড়ের ভেতর ঘোড়াদের শ্লেজ-টানার অভ্যাস করাতে লাগলেন। শীতের শেষে মেরু-অভিযানের জন্যে প্রত্যেকেই দেহের দিক থেকে নিজেকে সবল ও সক্ষম করে রাখবার উদ্দেশ্যে নিয়মিত কাজ আর ব্যায়াম সুরু করে দিলেন, যেতে হবে ন'শো মাইল আবার ফিরে আসতে হবে সেই ন'শো মাইল, সুতরাং সেই নিষ্করুণ আবহাওয়ার ভেতর অনিশ্চিত কঠিন তুষার-পথে আঠারোশ' মাইল হাঁটতে হবে, শরীরের দিক থেকে সম্পূর্ণ সবল না হলে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব।

কিন্তু স্কট জানতেন, শরীরকে সবল ও সক্ষম রাখার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজনীয় ছিল মনকে সক্ষম ও সতেজ করে রাখা। দীর্ঘদিন শুধু একঘেয়ে খাওয়া আর শোয়ার ভেতর থেকে মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মস্তিষ্ক অলস হয়ে আসে। তাই শীতের সেই অবরুদ্ধ জীবনে মানসিক ব্যায়ামের জন্যে স্কট নানারকমের উপায় উদ্ভাবন করলেন। সঙ্গে তাঁরা টাইপরাইটার যন্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই টাইপরাইটার যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা একটা কাগজ নিয়মিত প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করলেন, সেই কাগজের নাম হলো South Polar Times. স্কট যখন প্রথম ডিসকভারী অভিযানে আসেন তখন শ্যাকল্‌টন সময় কাটাবার জন্যে এই কাগজ প্রকাশ করার ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন করেন এবং সেই কাগজের নাম দেওয়া হয় South Polar Times. স্কট সেই প্রথাকে অনুসরণ করে এবারকার কাগজেরও সেই এক নাম রাখলেন এবং চেরী গারার্ড হলেন তার সম্পাদক।

এই কাগজ সযত্নে বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে এবং মেরু নির্জ্জনতায় প্রকাশিত টাইপ-করা এই কাগজ যেকোন শ্রেষ্ঠ ছাপানো কাগজের মতনই রচনা-সম্ভারে পরিপুষ্ট। উইলসন নিজের হাতে

এঁকে এই কাগজকে সচিত্র করে তুলতেন। ছাপানো কাগজে যেমন নানারকমের 'ফীচার' থাকে, এই কাগজেও নতুন নতুন সব ফীচার ছিল, তার মধ্যে সব চেয়ে মজার ছিল, Reader's Corner, পাঠকদের মন্তব্য। এই বিভাগে ওট্‌সের অনেক চিঠি আছে, সম্পাদকীয়ের ওপর কিংবা কোন প্রবন্ধের ওপর শ্লেষ করে ওট্‌স্ এই সব চিঠি লিখতেন। তাই নিয়ে রীতিমত বাদানুবাদ সুরু হয়ে যেতো।

এ ছাড়া স্কট আর একটা ব্যবস্থা করলেন, দলের প্রত্যেককে নিয়মিত লেকচার দিতে হবে, কে কোন্ বিষয়ে লেকচার দেবেন তা আগে থাকতেই জানানো হতো। কি করে শীলের মাংস রাঁধতে হয় থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-মেরুর আবহাওয়া-তত্ত্ব পর্য্যন্ত নানান বিষয়ে বক্তৃতা হতো এবং প্রত্যেক বক্তৃতার পর শ্রোতারা বক্তাকে তুমুলভাবে আক্রমণ করতেন, রীতিমত বাগ-যুদ্ধ বেঁধে যেতো।

দক্ষিণ-মেরুর একঘেয়ে শীত-রাত্রির বিরুদ্ধে এইভাবে সংগ্রাম চালিয়ে তাঁরা দিন গুণতে লাগলেন, কখন আবার উত্তর-আকাশে ফুটে উঠবে মেরু-সূর্য্যের আলো, সুরু হবে দক্ষিণ মেরুর দিকে বিজয় অভিযান···

শীতের রাত্রির অবসানে

১৪ই আগষ্ট···স্কট শীতের আস্তানা থেকে দেখলেন, দূরে ইরেবাস্ পাহাড়ের চূড়া থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে···তার তিন দিন পরে দেখলেন, ইরেবাস্ পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে! মেঘেতে হলুদ আর সিঁদুরের রঙ লেগেছে। অবসান শীতের দীর্ঘ রাত্রি!

সারাক্ষণ তাঁবুতে চলে উন্মাদ ব্যস্ততা···এইবার সুরু হবে শেষ অভিযান। আলোর স্পর্শে সকলের মনে নতুন উৎসাহ, নব স্পন্দন!

২৩শে আগষ্ট আকাশ-রেখাকে উদ্ভাসিত করে দেখা দিল সূর্য্য। সারাক্ষণ চলে যাত্রার আয়োজন। সকলের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে স্তম্ভিত উত্তেজনা···সকলের মন দিক-রেখা-যন্ত্রের সূঁচের মতন একাগ্র চেয়ে থাকে দক্ষিণ মেরুর দিকে।

শীতের দীর্ঘদিন ধরে স্কট অভিযানের প্লান তৈরী করেন। সেই প্লান অনুসারে প্রথমে একদল যাবে ছুটো মোটর শ্লেজ নিয়ে, যদি পথে মোটরের যন্ত্র খারাপ হয়ে যায় তাহলে দলের লোকদেরই শ্লেজ টেনে এগুতে হবে। মোটর শ্লেজের পরে যাত্রা করবে ঘোড়ায়-টানা শ্লেজেরদল। স্কট কুকুরদের ওপর একরকম ভরসা ত্যাগ করেছিলেন, তাই ঠিক করলেন সব শেষে এই কুকুর-টানা শ্লেজের দল যাত্রা করবে, তাদের শ্লেজে থাকবে ঘোড়াদের খাদ্য···এক-টন ডিপো পর্য্যন্ত তারা এই খাদ্য নিয়ে যাবে, সেখান থেকে যদি তারা সক্ষম হয়, তাদের অন্য মোট বইবার ভার দেওয়া হবে।

প্লান অনুযায়ী ঠিক হয়, ঘোড়ার দল বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ার পর্য্যন্ত মালপত্র আর খাদ্য নিয়ে যাবে অর্থাৎ ৪২০ মাইল তাদের যেতে হবে। সেখানে অবশিষ্ট ঘোড়াদের হত্যা করা হবে এবং তাদের মাংস মানুষ আর কুকুরদের খাদ্য হবে। বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ার থেকে তিন দলে ভাগ হয়ে তাঁরা দক্ষিণ-মেরুর সমতলভূমির ওপর দিয়ে এগুবেন, এখান থেকে প্রত্যেক দলকেই নিজেদের স্লেজ নিজে টানতে হবে। গ্লেসিয়ারের শেষে যেখান থেকে উঁচু সমতলভূমি আরম্ভ হয়েছে, তার মাঝামাঝি এসে দু'দল ফিরে আসবে, একদল শুধু সামনে দক্ষিণ-মেরুর দিকে এগিয়ে যাবে। এই শেষ দলে থাকবে, স্কটকে নিয়ে পাঁচজন লোক।

অতি সংক্ষেপে মোটামুটিভাবে এই প্লানের কথা এখানে বললাম কিন্তু আসলে ডিপো ফেলতে ফেলতে এই তিন দলের এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে এত যাওয়া-আসা আছে যে তার চার্ট দেখলে মাথা গুলিয়ে যায়। মাল-পত্র এবং খাদ্যের ভার অঙ্ক কষে ঠিক করে ডিপোতে রাখতে হবে এবং এমনভাবে সব আয়োজন করতে হবে যাতে শেষ পাঁচজন খুব কম ভার নিয়ে মেরুর দিকে এগুতে পারে এবং ফেরবার পথে প্রত্যেক ডিপোতে যাতে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জিনিসপত্র তারা পেতে পারে।

এই শেষ-অভিযানে কারা স্কটের সঙ্গী হবে, সেটা ঠিক করা হলো দলপতির শেষতম কঠিন দায়িত্ব। কারণ দীর্ঘ পথের চরম ক্লান্তির পর সেই শেষ দেড়শো মাইল পথ স্লেজ টেনে অগ্রসর হওয়া এবং তারপর সুদীর্ঘ ন'শো মাইল পথ মৃত্যু-ভরা আতঙ্ক আর আপদের ভিতর দিয়ে ফিরে আসার মধ্যে মানুষের দেহ ও মনের চরম শক্তি ও বীর্য্যের দরকার।

মনের ভেতর যদি কোথাও এতটুকু স্বার্থ বুদ্ধি থাকে, যদি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা থাকে, তাহলে নিমেষে তা ধরা পড়ে এবং একজনের দুর্বলতা অপর চারজনের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

স্কটের ডায়েরী থেকে বোঝা যায়, স্কট মোটামুটিভাবে এই শেষ সঙ্গী নির্বাচনের একটা সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে যেখানে কোন মানুষ সম্বন্ধেই বিরূপ ভাববার কিছু নেই, সেখানে তিনি তাদের দৈহিক উপযুক্ততার ওপরই নজর দেন। এখানে দৈহিক উপযুক্ততা মাপবার সব চেয়ে বড় জিনিস হলো, কে কতখানি মেরুর সেই প্রচণ্ড শীত সহ্য করতে পারবে। এই সম্পর্কে স্কটের নিজের একটা বিশ্বাস ছিল যে, যারা বয়সে তরুণ তারা মাঝামাঝি বয়সের লোকদের অপেক্ষায় কম শীত-সহ অর্থাৎ তরুণ দেহের ওপরই শীতের প্রভাব বেশী হয়। সেইজন্যে তাঁর শেষ সঙ্গীদের ভেতর থেকে তিনি তরুণদের বাদ দেন। শেষ যে-পাঁচজন নির্বাচিত হন তাঁরা প্রত্যেকেই মাঝামাঝি বয়সের লোক ছিলেন।

২রা নভেম্বর, আমাদের ঘড়িতে তখন রাত আট-টা, শীতের আস্তানা ত্যাগ করে প্লান অনুযায়ী আগে পরে তাঁরা যাত্রা করলেন দক্ষিণ মেরুর দিকে……

স্কটের মনে নীরবে জেগে ওঠে জিজ্ঞাসা, আমুনসেন এখন কোথায়?

সর্ব্বশেষে পাঁচজন

পূবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে পড়ে আছে তুষার মহাদেশ, তুষারের মরু-ভূমি, যার আয়তন চার কোটি বর্গ মাইল ! দক্ষিণ-মেরু মহাদেশ।

সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে এই বিরাট মহাদেশ আকাশ-পৃথিবী-জোড়া মহা-নিস্তব্ধতায় এমনি পড়ে আছে, আজ তার বুকে পদ-রেখা এঁকে এগিয়ে চলেছে সর্বজয়ী মানুষ···দুর্বার তার পণ সে পৌছবে গিয়ে তার হৃদ্ কেন্দ্রে। চার কোটি বর্গ মাইল তার কাছে অজানা পড়ে আছে, মস্তিষ্ক-অভিমানী মানুষ কিছুতেই তা সহ্য করবে না। পৃথিবীর সব রহস্য সে জানবে, অজ্ঞেয় কিছু থাকবে না তার কাছে।

যেখান থেকে তাঁরা যাত্রা করলেন, দক্ষিণ-মেরুর কেন্দ্র হলো সেখান থেকে ন'শো মাইল দূরে। এই ন'শো মাইল পথের প্রথম অংশ হলো, গ্রেট আইস্ ব্যারিয়ার যেখানে এসে বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ারে শেষ হয়েছে। সমুদ্রের দিক থেকে দক্ষিণে মাইলের পর মাইল গিয়ে এই ব্যারিয়ার অঞ্চল পাহাড়-ঘেরা গ্লেসিয়ারে শেষ হয়েছে। সেখান থেকে সুরু হবে, এই অভিযানের দ্বিতীয়-পর্ব, পাহাড়-ঘেরা গ্লেসিয়ার পেরিয়ে যেতে হবে দক্ষিণ-মেরুর মালভূমিতে। তৃতীয় পর্ব হলো, দক্ষিণ-মেরুর এই মালভূমি অতিক্রম করে দক্ষিণ-মেরুর কেন্দ্রে গিয়ে পৌছানো।

দক্ষিণ-মেরুর দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই চারদিকের প্রকৃতি এক বিচিত্র রূপ ধরে। যেদিকে চাও, যতদূরে চাও, শুধু একই দৃশ্য, একই তুষার-শুভ্রতা, চিহ্ন-হীন ছেদহীন বৈচিত্র্যহীন নিঃশব্দ এক মহাশুভ্রতার অনন্ত বিস্তার। এখানকার আবহাওয়ায় ধূলোর কণা নেই,

বাতাসে নেই জলবিন্দু, সূর্য্যের আলো তাই এখানে বিচিত্র স্বচ্ছ! এই বিচিত্র আবহাওয়ার জন্যে এখানে পদে পদে মানুষ মরীচিকা দেখে, ভয়াবহ মরীচিকা। আলোর বিচিত্র কম্পনের জন্যে এখানে দূর থেকে সব জিনিসকেই বিকৃত দেখায়। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হবে, সামনে যেন অসংখ্য শাদা গরু চরে বেড়াচ্ছে, দশ মাইল দূরে যে তাঁবু রয়েছে মনে হবে যেন দুপা গেলেই সে-তাঁবুতে পৌঁছানো যাবে, যতই এগিয়ে চল ততই তাঁবু দূরে সরে যায়, কিছুক্ষণ পরে মনে হয়, যেন একটা বিচিত্র দেশের মধ্যে দিয়ে তারা চলেছে, যেখানে দৈর্ঘ্য বা প্রস্থতা বলে কিছু নেই।

আবহাওয়াও ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায় এবং এই পরিবর্ত্তন এত দ্রুত আর এত আকস্মিক যে আত্মরক্ষার অবকাশ পাওয়া যায় না। মিনিটে মিনিটে মেরু-প্রকৃতির রূপ বদলাতে পারে। এই আকাশ-ভরা ঝলমল সূর্য্যের আলো, কয়েক পা যেতে না যেতেই কোথা থেকে ধেয়ে এলো ঘন কালো মেঘ···দেখতে দেখতে উঠলো ঝড়···কয়েক নিমেষের মধ্যে তা গর্জে ওঠে ব্লিজার্ডে। তখুনি তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না ব্লিজার্ড যায় থেমে। ব্লিজার্ড বা তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে সব চেয়ে অসুবিধা হয় ঘোড়াদের, চোখে মুখে বরফ বসে যায়, চলতে আর পারে না।

স্কটের দুর্ভাগ্য, দু'একদিন এগুতে না এগুতে পর্য্যায়ক্রমে আসতে সুরু করলো, ব্লিজার্ড আর তুষারের বাধা। বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষা করা মানে, নষ্ট হয়ে যায় রুটিন-বাঁধা বহুমূল্য সময়, অকারণে নষ্ট হয় হিসেব-করা খাদ্য। গতি হয়ে আসে শ্লথ। কোন রকমে গড়পড়তা দিনে দশ মাইল করে তাঁরা এগুতে লাগলেন। ৬৫ মাইল অন্তর তৈরী

করেন একটা করে ডিপো। ডিপোতে হিসেব করে ফেরবার পথের খাদ্য ও অন্য দরকারি জিনিসপত্র জমা রেখে এগুতে হয়।

যাবার সময় সব চেয়ে বিপদ বাঁধলো তুষার-হাওয়ায়। তুষার হাওয়ার ফলে সব জিনিসের ওপর নরম হাল্কা নানা রকমের তুষার-কণা জমা হয় কিন্তু স্কট দেখলেন এ আর এক-ধরণের তুষার কণা, রীতিমত শক্ত পাতের মতন জমা হয়ে যায়। মোটর-যন্ত্রের ওপর এমনভাবে জমা হতে থাকে যে যন্ত্র বন্ধ হয়ে আসে। হাতের আঙুল সে-তুষার-সংস্পর্শে এলে অবশ হয়ে যায়। কয়েক দিনের অভিযানের পরই তাঁরা তাঁবুতে নিজেদের চেহারা দেখে অবাক হয়ে যান, ইতিমধ্যেই সকলের দাড়ি গোঁপ বুনো মানুষদের মতন গজিয়ে উঠেছে। দাড়ি কামাবেন, তার উপায় নেই। মেরু-অভিযানে দাড়ি কামানো বা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, এমন কি স্নান করা রীতিমত ব্যয়সাধ্য বিলাসিতার ব্যাপার। কারণ, এ সব কাজের জন্যে জল চাই ; জল পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আগুণে বরফ গলিয়ে জল তৈরী করা, আগুণ জ্বালাতে গেলেই স্পিরিট বা কয়লা খরচ করতে হবে! মেরু-অভিযানে আগুণ তৈরী করবার জিনিসগুলি এত প্রয়োজনীয় যে ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার দরুণ তা খরচ করা চলে না।

এইভাবে ১৫ই নভেম্বর তাঁরা এক-টন-ডিপোতে এসে একত্র হলেন। মাত্র ১৩০ মাইল তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। স্কট শঙ্কিত হয়ে পড়েন, গতির মাত্রা না বাড়ালে সমস্ত টাইম্-টেবল্ ওলোট-পালট হয়ে যাবে।

২৯শে নভেম্বর তাঁরা বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ারের প্রবেশমুখে এসে দাঁড়ালেন। সকালে তাঁবু থেকে চেয়ে দেখেন, আকাশ পরিষ্কার হয়ে

গিয়েছে, সামনেই মেঘের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্লেসিয়ার সংলগ্ন সব পাহাড়। চারদিকে দেড় হাজার মাইল ব্যাপিয়া তরঙ্গায়িত হয়ে রয়েছে এই পাহাড়ের শ্রেণী, নিতান্ত ছোট-খাটো পাহাড় সব নয়, কোন কোন পাহাড়ের চূড়া প্রায় ১৫ হাজার ফিট উঁচু। ঘোড়াদের অবস্থা দেখে স্কট শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, সন্দেহ হয় গ্লেসিয়ারের এই দুরূহ পথ পেরিয়ে ঘোড়ারা মালভূমিতে পৌঁছতে পারবে কি না! ওট্স্ আশ্বাস দেন, তিনি যেমন করে পারেন ঘোড়াদের দিয়ে এ কাজ করিয়ে নেবেন।

পাহাড়-শ্রেণীকে পাশে রেখে আবার অভিযান এগিয়ে চল্লো। কিন্তু ওট্সের সমস্ত আশাকে চূর্ণ করে কিছুদূর যেতে না যেতেই জেহু আর চীনাম্যান নামে দুটো ঘোড়া পা দুমড়ে বসে পড়লো। স্কট বুঝলেন, তারা আর চলতে পারবে না। তখন বাধ্য হয়েই হুকুম দিলেন, তাদের গুলি করে মেরে ফেলতে। জীবিত অবস্থায় তারা যে-সাহায্য থেকে অভিযাত্রীদের বঞ্চিত করলো, মরণে তা পরিপূরণ করে দিলো। তাদের মাংস পথের খাদ্য হবে। কুকুর ও মানুষ, দুয়েরই।

ইতিমধ্যেই ব্লিজার্ডের জন্যে প্রায় ১০ দিন সময় তাঁদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ করে নেবার জন্যে তাঁরা গতির মাত্রা বাড়াতে গিয়ে দেখলেন, ব্লিজার্ডের দরুণ সামনের পথ নরম তুষারে ভরে গিয়েছে। এক হাঁটু জল-কাদার মত এক হাঁটু তুষারের শাদা-কাদার ভেতর দিয়ে তাঁদের এগিয়ে চলতে হলো, সেই তুষার ঠেলে যেতে প্রত্যেকেই অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনদিন ধরে সেই ভাবে অমানুষিক চেষ্টা করে তাঁরা মাত্র বারো মাইল পথ এগোলেন। তার পর থেকে আবার শক্ত তুষার দেখা দিলো। শক্ত তুষার পাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে দেহ ও মনের সমস্ত অবসাদ ভুলে তাঁরা প্রত্যেক দিন আগের দিনের চেয়ে বেশী হাঁটতে সুরু করলেন। প্রথম দিন যেখানে ১৭ মাইল হাঁটলেন, দ্বিতীয় দিন সেখানে ২০ মাইল এগোলেন, তৃতীয় দিন ২৩ মাইল এগুলেন। এগুতেই হবে, দ্রুত এগুতে হবে, সময় নেই, খাদ্য ফুরিয়ে আসতে পারে।

এইভাবে গ্লেসিয়ার অঞ্চলের মাঝামাঝি এসে পড়লেন। সামনে পেছনে যেদিকেই যাও, নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রের মতন পড়ে আছে সূর্য্যালোকিত গ্লেসিয়ারের নীল তুষার-ভূমি। আর তাকে ঘিরে রামধনু রঙা তুষার-শীর্ষ সব পাহাড়। সেই অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যান উইলসন। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ফাঁকে যখনি বিন্দুমাত্র অবকাশ পান, কাগজ তুলি নিয়ে বসে যান, সেই অপরূপ দৃশ্য তুলির আঁচড়ে ধরে রাখতেই হবে। দলপতির হুইসল্ বাজার সঙ্গে সঙ্গে উইলসন কাগজ আর তুলি তুলে আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন।

এইভাবে তাঁরা গ্লেসিয়ারের আর এক প্রান্তে এসে পড়লেন। যে দল কুকুর-টানা শ্লেজ নিয়ে আসছিল, এখান থেকে তাদের ফিরতে হবে। সেদিন রাত্রিতে তাঁবুতে তাঁদের ফিরে যেতে বলতে গিয়ে স্কটের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠলো। তাঁর আদেশ মাত্রই তাঁদের ফিরে যেতে হবে, কোন প্রশ্ন করবার অধিকারও তাঁদের নেই। কিন্তু এই আদেশ শোনার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই চরম আশা নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার শেষ অভিযাত্রী দলে নিশ্চয়ই তিনি থাকবেন, এই গৌরবের জন্যেই প্রত্যেকে জীবন তুচ্ছ করে এই দুরূহতম অভিযানে এতদূর এসেছেন। কিন্তু দলপতির আদেশ, তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে।

ভোর না হতেই আবার সুরু হলো যাত্রার আয়োজন। চারজন ফিরে গেলেন যে পথে এসেছিলেন সেপথ ধরে, ৮জন এগিয়ে চল্লেন সামনে মালভূমির দিকে। বিদায়ের সময় এক অকথিত নীরব বেদনা সকলকেই মুহ্যমান করলো কিন্তু বাইরে বিন্দুমাত্র দীর্ঘশ্বাসে তা কেউ প্রকাশ করলেন না।

প্রত্যেক ডিপোতে ভার নামাতে নামাতে এখন প্রত্যেক যাত্রীর ভার ৪শো পাউণ্ড থেকে ১৯০ পাউণ্ডে নেমে এসেছে। কিন্তু দেহের সেই চরম অবসন্ন অবস্থায় সেই ভার টেনে বরফের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলা অমানুষিক শক্তির দরকার।

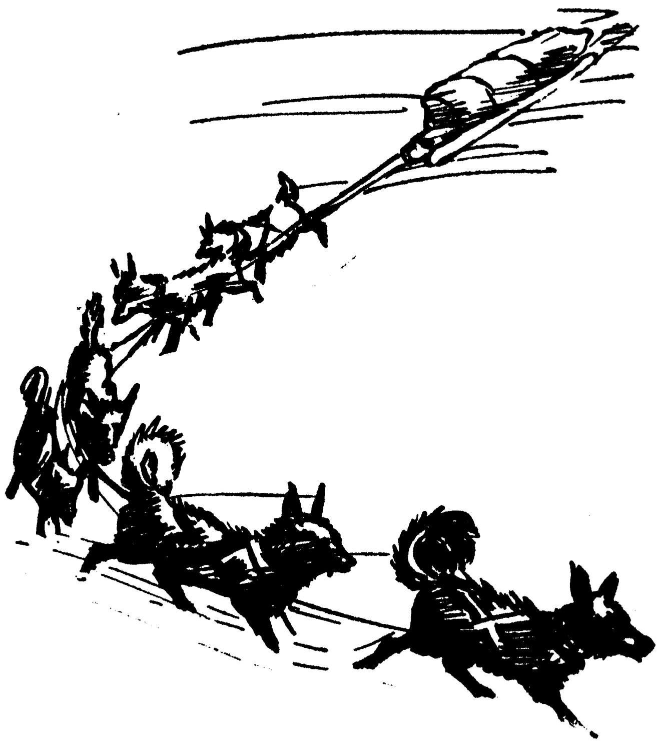
৩রা জানুয়ারী তাঁরা গ্লেসিয়ার পেরিয়ে মালভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে দক্ষিণ-মেরু আর ১৪৬ মাইল দূরে। কিন্তু সেদিন রাত্রিতে তাঁবুতে কেউ আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে পর্য্যন্ত পারলেন না। কারণ, তাঁরা জানতেন, রাত ভোর হলেই দলপতি আরো তিন-জনকে সেখান থেকে ফিরতে আদেশ করবেন, বাকি পাঁচজন এগিয়ে যাবেন দক্ষিণ-মেরুর দিকে, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অর্জ্জনে। কোন্ তিনজন ফিরে যাবে? এই মহা-গৌরবের দ্বার-প্রান্তে এসে নীরবে ফিরে যেতে হবে কাকে কাকে? সেদিন রাত্রিতে কারুরই চোখে এলো না ঘুম।

ভোর না হতেই সংযত কণ্ঠে স্কট ঘোষণা করলেন, লাস্‌লী, ক্রীণ আর লেফ্‌টেনান্ট ইভান্‌স্‌কে ফিরে যেতে হবে···শেষ অভিযানে তাঁর সঙ্গে যাবেন ওট্‌স্‌, উইলসন, সীম্যান ইভান্‌স আর বোয়ার্স।

নীরবে যাত্রার আয়োজন শেষ হলো। বিদায়ের সময়ে প্রত্যেকে চোখ তুলে দেখেন, প্রত্যেকের চোখে জল।

পাঁচজন লোক সেখান থেকে এগিয়ে চল্লো, দক্ষিণে···তিনজন লোক ফিরলো উত্তরে। উত্তরমুখী লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখে, শুভ্র তুষারের সমতল ভূমির ওপর দিয়ে পাঁচটী লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে··· যোজনান্ত শুভ্র তুষারের বুকে পাঁচটা কালো দাগ···

সেই শেষ দেখা···



একসঙ্গে জয় ও পরাজয়

এতখানি পথ যে তাঁরা চলে এলেন, কোথাও আমুনসেনের দলের কোন চিহ্ন তাঁরা দেখতে পেলেন না। পাঁচজনের মনে সংগোপনে ফুটে ওঠে আশা, বৃথা আশঙ্কা, তাঁরাই প্রথম চলেছেন এই পথে, তাঁরাই প্রথম গিয়ে পৌঁছবেন দক্ষিণ-মেরুতে!

সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে দুরন্ত উৎসাহ···মাত্র আর ১৪৬ মাইল···এইভাবে এগিয়ে চলতে পারলে দশদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন! সঙ্গে তাঁদের একমাসের মতন খাবার!

কিন্তু একদিন না যেতে যেতেই হঠাৎ মেরু-প্রকৃতি গেল বদলে··· পায়ের তলায় কঠিন সমতল তুষারের বদলে আবার দেখা দিলো তুলোর মতন নরম তুষার, সে-তুষারের ভেতর দিয়ে Ski টেনে যাওয়া অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা আবার নিজের হাতে মাল-পত্র টেনে চলতে আরম্ভ করলেন, গতির মাত্রা গেল অসম্ভব রকম কমে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নীল তুষারের আবহাওয়াকে ঝাপসা করে এলো দুরন্ত ব্লিজার্ড। প্রত্যেকেই সে-ব্লিজার্ডে মারাত্মকভাবে আহত হলেন, ইভান্‌সের ডান হাত অবশ হয়ে গেল, কিন্তু কেউ-ই মুখ ফুটে নিজের ক্ষতির কথা, নিজের বেদনার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না। স্কট লক্ষ্য করলেন, ইভান্‌সের হাতে ঘা দেখা দিয়েছে, সে হাত দিয়ে আর মাল টানা সম্ভব নয়···কিন্তু উপায় কি! টানতেই হবে। স্কট একদিন বিশ্রামের জন্যে তাঁবু ফেল্লেন। ইভান্‌সের হাত ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। পরের দিনই তাঁরা আবার বেরিয়ে পড়লেন। ঠিক করলেন, দেহের

শেষতম শক্তি দিয়ে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে চলবেন···মরতে হয়, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছে মরবেন।

জোর করে সেই তুষার ঠেলে দ্রুত চলতে গিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের শরীর প্রায় ভেঙ্গে পড়বার মতন হলো কিন্তু সামনেই দক্ষিণ-মেরু, সে কথা ভাববার সময় আর কোথায় ?

১৫ই জানুয়ারী···সামনে আর মাত্র ২৭ মাইল! হাত-পা প্রত্যেকেরই প্রায় অবশের মত হয়ে আসে কিন্তু সেকথা কেউ মনেও ভাবে না। চলতে চলতে হঠাৎ বোয়ার্সের নজরে পড়লো, কিছু দূরে শাদা তুষারের ওপর কালো মত ওটা কি ?

প্রত্যেকেই সেইদিকে চেয়ে দেখেন, প্রত্যেকেরই মনে কেঁপে ওঠে এক প্রশ্ন, তবে কি ওটা আমুনসেনের আগে-আসার চিহ্ন ?

কেউ কোন কথা বলেন না···অবসন্ন দেহকে টেনে দ্রুত এগিয়ে চলেন···

পরের দিন তুষার পথে হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ে···তুষারের ওপর Ski চলে-যাওয়ার চিহ্ন···চিহ্ন বাড়তে থাকে···

পরের দিন···১৭ই জানুয়ারী···সামনেই দক্ষিণ-মেরু···স্কট যন্ত্রপাতির সাহায্যে দক্ষিণ-মেরুর কেন্দ্রস্থল নির্দ্দিষ্ট করেন···সামনেই চেয়ে দেখেন কয়েক গজ দূরে, একটা ভাঙ্গা স্লেজের ওপর উড়ছে একটা পতাকা···নরওয়ের পতাকা।

এগারো সপ্তাহ ধরে সেই অমানুষিক পরিশ্রমের পর, অবসন্ন ভগ্ন দেহে তাঁরা বুঝলেন, দক্ষিণ-মেরুতে তাঁরা পৌঁছেছেন বটে কিন্তু আমুনসেন তাঁদের পরাজিত করে দক্ষিণ-মেরু বিজয়ীর প্রথম গৌরব নিয়ে চলে গিয়েছেন।

চরম জয়ের মুহূর্ত্ত ম্লান হয়ে যায় পরম বেদনায়। অবসন্ন ভগ্ন-প্রায় দেহে সে-বিফলতাকে মেনে নিতে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে যায়। কিন্তু যা অনিবার্য্য তাকে মেনে নিতেই হবে!

দক্ষিণ-মেরুর সেই মহা-নির্জ্জনতায় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পাঁচজন মানুষ ···প্রত্যেকে প্রত্যেককে সান্ত্বনা দেয়, তাতে কি হয়েছে! আমাদের কাজ আমরা করেছি···দক্ষিণ-মেরুতে পৌছবো বলে বেরিয়েছিলাম, পৌঁছিয়েছি।

কিন্তু প্রত্যেকেই নীরবে মনের গভীরে অনুভব করেন, যেন সব আলো নিভে গিয়েছে! যে-উৎসাহ নিয়ে এই মৃত্যু-ভরা ন'শো মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছেন, ফেরবার সময় সে-উৎসাহের একটা কণাও কি থাকবে? অথচ ফিরতে হবে এই ন'শ মাইল পথ! মনে হয়, ফেরবার পথের দৈর্ঘ্য ন'শ মাইল নয়, ন'হাজার মাইল! এই অবসন্ন দেহমন নিয়ে তাঁরা কি এই দূর পথ অতিক্রম করতে পারবেন?

কিন্তু বাইরে মুখ ফুটে একটা নিরাশার কথা কেউ বলে না। যথা-রীতি স্কট তাঁর কর্ত্তব্য পালন করে চলেন। ইংলণ্ডের নামে স্কট দক্ষিণ-মেরুতে রাণী-মার দেওয়া য়ুনিয়ন জ্যাককে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করলেন। সঙ্গীদের ডেকে বল্লেন, জয় পরাজয় জানি না, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করেছি!

সেদিন তাঁবুতে তাঁরা এই ঘটনার গৌরবে একটা বিশেষ ভোজের অনুষ্ঠান করলেন। ভোজের বিশেষত্ব হলো, এই উৎসবের জন্যে তাঁরা পাঁচখানা চকোলেটের পাত্ সঙ্গে সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছিলেন। প্রতি-দিনের নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের পর প্রত্যেকেই আনন্দে এক এক টুকরো চকোলেট খেলেন। সেই হলো দক্ষিণ-মেরু-বিজয়ের বিশেষ ভোজের বিলাসিতা!

উইলসন্ আর একটা জিনিস লুকিয়ে সঙ্গে করে এনেছিলেন। যেদিন তাঁরা দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছবেন, সেদিনকার মহা-উৎসবকে চিহ্নিত করবার জন্যে তিনি বহুকষ্টে তিনটে সিগারেট বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলেন। যাতে সিগারেট তিনটে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্যে উইলসন রোজ সংগোপনে গোপন মাণিকের মতন নাড়াচাড়া করে দেখতেন। তিনি নিজে সিগারেট খেতেন না, বোয়ার্স ও খেতেন না, তাই তিনি স্কট, ওট্স আর ইভান্সের জন্যে সেই তিনটে সিগারেট রেখেছিলেন। সেদিন তাঁবুতে ভোজের পর উইলসন মহা-উল্লাসে সেই তিনটী সিগারেট তিনজনের মুখে ধরিয়ে দিলেন।

সিগারেটের ধোঁয়ায় মন চলে যায়, দূরে, বহুদূরে, ইংলণ্ডে···

পরের দিন স্কট আমুনসেনের পরিত্যক্ত তাঁবুতে গিয়ে দেখলেন, আমুনসেন তাঁর জন্যে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন। অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি,

"আমার বিশ্বাস আমাদের পর আপনারাই এখানে এসে পৌঁছবেন। আমার কিছু বাড়তি জিনিস আপনাদের ব্যবহারের জন্যে রেখে গেলাম। ব্যবহার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। সেই সঙ্গে নরওয়ের রাজা সপ্তম হ্যাকনের নামে একটা চিঠি এখানে রেখে গেলাম, যদি কোন কারণে আমি না ফিরতে পারি আপনি অনুগ্রহ করে এই চিঠিটা নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দেবেন। সর্ব্বান্তকরণে কামনা করি, আপনাদের ফেরবার পথ বিঘ্নহীন হোক্,—

ইতি—

আমুনসেন, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১১।

চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে সেইদিনই তাঁরা যাত্রা সুরু করলেন, ফেরবার পথে···

বিশ্রাম করবার সময় নেই···ফিরতে হবে দীর্ঘপথ···দ্রুত এগিয়ে আসছে শীতের দিন···দুরন্ত ব্লিজার্ডের দিন···তার আগেই ফিরতে হবে হাট পয়েন্টে···



ফেরবার পথে

ফিরে চলে অবসন্ন ক্লান্তদেহে পাঁচটী প্রাণী···ফিরে চলে ইতিহাসের অমর-লোকে···

সর্ব্ব-প্রথমের জয়মালা নিয়ে গেলেন আমুনসেন কিন্তু তার চেয়েও মহা-গৌরবের জয়মালা অপেক্ষা করেছিল তাঁদের জন্যে ফেরবার পথে···

এ্যাডভেঞ্চারের প্রতিযোগিতায় তাঁরা হয়ে গেলেন দ্বিতীয়, মানবতার পরীক্ষায় হবেন অদ্বিতীয়···

দক্ষিণ-মেরুতে আসবার পথে তাঁরা ছিলেন দুঃসাহসী পর্য্যটক··· ফেরবার পথে তারা হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর মানুষ···

আসবার পথে তাঁরা আবিষ্কার করলেন দক্ষিণ-মেরুকে, ফেরবার পথে তাঁরা আবিষ্কার করলেন এই মৃত্যুময় দেহে মানুষের মনের অমর শক্তিকে···মানুষের অমর বীর্য্যকে, মৃত্যুর সামনে যা ম্লান হয় না, ভীত হয় না, কুণ্ঠিত হয় না···মৃত্যুর হাত থেকেই যা নেয় অমৃতের প্রসাদ !

আসবার সময় পথে বিপদ ছিল, বিঘ্ন ছিল কিন্তু ফেরবার পথে সমস্ত দক্ষিণ-মেরু যেন বিরূপ হয়ে উঠলো···এই খর সূর্য্যের আলো, তুষারে প্রতিবিম্বিত হয়ে চোখকে অন্ধ দৃষ্টিহীন করে তোলে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোথায় মুছে যায় সে-আলো, জেল-ভাঙ্গা কয়েদীর মতন ছুটে আসে তুষার-ঝড়, যেখানে লাগে তুষারের ছোঁয়া সেখানেই যায় অবশ হয়ে। এই তাঁরা চলেছেন কঠিন তুষারের পথ ধরে, পথে রয়েছে তাঁদেরই আসবার চিহ্ন, বরফের ওপর Ski-এর দাগ···সেই দাগ ধরে তাঁরা এগিয়ে চলেন, অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় সেই কঠিন তুষার, তার

বদলে দেখা দেয় তুলোর মতন নরম বরফ, কোন পথের চিহ্ন নেই তাতে, কোমর পর্য্যন্ত ডুবে যায় সে-তুষারে, এক-পা এগোতে লাগে এক মাইল চলার পরিশ্রম।

তুষার-ঝড়ে অন্ধ হয়ে আসে ইভান্‌সের দৃষ্টি···ব্লিজার্ডে নাকে কাণে হাতের আঙুলে ঘা হয়ে যায়, তবুও সেই আহত হাত দিয়ে বোঝা টেনে চলেন, যন্ত্রণা হলে চীৎকার পর্য্যন্ত করেন না, পাছে তাঁর জন্যে সঙ্গীরা বিব্রত হয়ে পড়েন।

সবাই চলেছে, তাঁকেও চলতে হবে! দলপতির আদেশ, দ্রুত চলতে হবে···কারণ চারদিকের লক্ষণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শীতের দুরন্ত ঝড়ের দিন বুঝি নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই এসে পড়ে!

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন ইভান্‌স্ চলতে চলতে পড়ে গেলেন, চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি সকলের পেছনে আসছিলেন। হঠাৎ স্কট পেছন ফিরে দেখেন, ইভান্‌স্ নেই!

ওট্‌স্‌কে পাঠালেন, কি ব্যাপার দেখবার জন্যে। ওট্‌সের পায়ের নখ তখন গলে বেরিয়ে গিয়েছে, যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সমস্ত পা অবশ হয়ে আসে, তবুও ওট্‌সের মুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। পেছন ফিরে ছুটে চল্লেন, দেখেন ইভান্‌স্ অচৈতন্য হয়ে বরফের ওপর শুয়ে।

সেদিন সেখানেই স্কট তাঁবু ফেলতে বাধ্য হলেন, ধরাধরি করে ইভান্‌স্‌কে তাঁবুতে নিয়ে এলেন। তিনদিন চলে গেল তাঁবুতে ইভান্‌স্‌কে শুশ্রূষা করতে। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে স্কটের অন্তর। মারাত্মক এই তাঁবুতে অপেক্ষা করে থাকা। পথের দুরবস্থার জন্যে তাঁদের গতির মাত্রা এতো কমে এসেছিল যে, এক ডিপো থেকে আর এক ডিপো পর্য্যন্ত পৌঁছতে নির্দ্দিষ্ট দিনের ডবল লেগে যাচ্ছে। সঙ্গে যে হিসেব-করা

খাদ্য আছে, দেরী হওয়ার দরুণ তা অর্দ্ধেক করে খেতে হয়, তাতে শরীর আরো অবসন্ন হয়ে পড়ে।

নিজের দুর্ব্বলতায় ইভান্‌স্‌এর মন বেদনায় ভরে ওঠে। তাঁর জন্যে সকলেই শাস্তি পাচ্ছে, দেরী হয়ে যাচ্ছে। অবশ দেহকে জোর করে টেনে তোলেন, আবার যাত্রা সুরু করেন। কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই আবার অচৈতন্য হয়ে পথের ওপর পড়ে যান। আবার তাঁর জন্যে তাঁবু ফেলতে হয়, অপেক্ষা করে থাকতে হয়। আবার ইভান্‌স্‌ উঠে হাঁটতে আরম্ভ করেন।

এবার বোঝা টানা থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া হলো। তাঁর বোঝা পালা করে অন্য চারজন টানে। কিন্তু তুষারের আঘাতে ক্রমশ ইভান্‌স্‌এর সারা মুখ অবশ হয়ে আসে। চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ার পেরিয়ে ইভান্‌স্‌ একদিন আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। ওটস্‌ ছুটে এসে দেখেন, ইভান্‌সের দেহে আর প্রাণ নেই…

সেই মেরু-নির্জ্জনতায় ইভানস্‌এর মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়ে ওটস্‌ ভাবেন, দলের সকলের কাছে গোপন করলেও তিনি জানেন, তিনিও আর চলতে পারছেন না। কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বলবারও তাঁর অধিকার নেই।

নীরবে সেই চিহ্নহীন তুষারে ইভান্‌সের মৃতদেহকে সমাহিত করে চারজন এগিয়ে চলেন।

কিন্তু এমন একদিন এলো যখন ওট্‌স্‌ আর চলতে পারেন না… পায়ের আঙুলের ডগায় সব ঘা হয়ে গিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হয়ে একদিন রাত্রিতে তাঁবুর ভেতর শুধু উইলসনের কাণে কাণে বল্লেন, বন্ধু, বল, আমি কি করবো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উইলসন বলেন, তবু চলতে হবে !

তবু চলতে হয়···

প্রত্যেকেরই দেহ অবসন্ন···প্রত্যেকেরই দেহের কোন না কোন অংশ তুষারে আর ঝড়ে অবশ পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। বরফের ফাটলে পড়ে গিয়ে স্কটের গোড়ালী দুমড়ে ফুলে যায়···পা সোজা করে ফেলতে পারেন না···

তবু চলতে হয়···তবু চলতে হবে···

কিন্তু গতি হয়ে আসে অসম্ভব রকম শ্লথ।

এমন সময় অকস্মাৎ সময়ের আগে নেমে এলো দক্ষিণ-মেরুর শীতের দিনের তুমুল তুষার-ঝড়···বাতাস নয়, ঝড় নয়, শুধু ধাবমান তুষার-কণা ···ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চলেছে তীরের মতন তুষারের বৃষ্টি ! এক হাত সামনে কিছু দেখা যায় না···কোথায় পথ···কোথায় ডিপো ···কে জানে ?

সেই অন্ধ-করা তুষার-ঝঞ্ঝার ভেতর তাঁবু ফেলতে গিয়ে প্রত্যেকেই তুষার-আহত হয়ে পড়েন। তাঁবুর ভেতর ঘুমোবার ব্যাগ পর্য্যন্ত ভিজে ওঠে, পায়ের ভিজে জুতো আর শুকোয় না।

নিঃশব্দে তাঁবুর ভেতর চারজন অপেক্ষা করে থাকেন, কখন কবে এই তুষার-ঝঞ্ঝা থামবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। শত সহস্র হিংস্র শার্দ্দুলের মত্ত চীৎকারের মতন সারাদিন সারারাত সেই তাঁবুকে ঘিরে চলে ঝড়ের আর্ত্তনাদ।

সঙ্গে যে খাদ্য ছিল, তা ফুরিয়ে আসে। অবশিষ্ট অতি সামান্য খাদ্য চারজনে সমান ভাগ করে গ্রহণ করেন। সেই সামান্য খাদ্য একজনের একবেলারও জলযোগের মতনও হয় না। ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে আসে প্রত্যেকের দেহ।

স্কটের অন্তরে প্রেতমূর্ত্তির মতন জেগে ওঠে, অনিবার্য্য মৃত্যুর ঘন কালো ছায়া। দলপতির কর্ত্তব্য হিসাবে তিনি উইলসনকে আদেশ করলেন, বিষের বড়ি প্রত্যেককে দিতে। এই বিষ উইলসনের জিম্মায় ছিল। দলপতির আদেশে উইলসন প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন বিষের বড়ি।

সেদিন মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ ওট্স্ ঘুমোবার ব্যাগ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড় সমানে চীৎকার করে চলেছে, অন্ধকারে জমে উঠছে তুষারের পর তুষার। ওট্সের মনে পড়ে ইভান্সের মৃতদেহ। সেই সঙ্গে জেগে ওঠে মনে মহাসংকল্প, আমি যদি চলে যাই, আমার খাদ্যের অংশে এরা হয়ত বেঁচে থাকতে পারে।

দেখেন, স্কট নীরবে তখন ডায়েরী লিখছেন। স্কটের সামনে বিষের বড়িটা ওট্স্ ফেলে দেন। বিষ খেয়ে মরা, সে তো পরাজয়!

স্কট ঘাড় তুলে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার ওট্স্?

শান্তকণ্ঠে ওটস্ বলেন, আমি বাইরে যাচ্ছি···হয়ত ফিরতে দেরী হবে···

সঙ্গে সঙ্গে ওটস্ সেই ব্লিজার্ডের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন···

আর ফিরে এলেন না···

বাইরে গর্জ্জন করে চলে ব্লিজার্ড···তাঁবুর ভেতর মহা-নীরবে তিনটী প্রাণী অপেক্ষা করে থাকে মহা-অনিবার্য্যের জন্যে···কারুর মুখে কোন অভিযোগ নেই···কোন হাহাকার নেই···কোন চঞ্চলতা নেই···

সঙ্গে মাত্র ছদিনের মতন সামান্য খাদ্য···আগুণ জ্বালাবার জন্যে সামান্য স্পিরিট···

পরের দিন ব্লিজার্ডের বেগ একটু কমে আসে···স্কট বলেন, এভাবে সংগ্রাম থেকে সরে থাকার কোন মানে হয় না···এখনো যখন দেহেতে শক্তি রয়েছে···বসে থাকবো কেন ?

সেই ঝড়ের ভেতর তাঁবুর আশ্রয় ছেড়ে তিনজন বেরিয়ে পড়েন···

অবসন্ন দেহকে কোন রকমে টেনে তাঁরা দুদিন আরো এগিয়ে চলেন···কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন ব্লিজার্ডের বেগ আবার দুরন্ত হয়ে উঠলো···আবহাওয়া জিরো ডিগ্রীর ৪০ ডিগ্রী নীচে নেমে গেল···চোখ মুখ তুষার-ঝাপটায় রক্তহীন হয়ে যায়···সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে···

সেই ঝড়ের মধ্যে কোন রকমে তাঁরা তাঁবু ফেল্লেন···

কিন্তু হাত-পা আর চলে না...সঙ্গে যেটুকু স্পিরিট ছিল, তা দিয়ে আগুন জ্বেলে তিন জনে তিন কাপ চা খেলেন···

কাল সকালে আর কোন খাদ্য থাকবে না···আগুন জ্বালবার জন্যে আর এক ফোঁটা তেল থাকবে না···

তাঁবুর ভেতর অবসন্ন ক্লান্ত দেহে তিনজন উঠে দাঁড়ান, সৈনিকের মতন পাশাপাশি মাথা সোজা করে দাঁড়ান, সমস্বরে তিনবার জয়-ধ্বনি করে ওঠেন,

Three Cheers for England ! তারপর যে-যার ঘুমোবার ব্যাগে শুয়ে পড়েন···

সে-শয্যা থেকে তাঁরা আর জেগে ওঠেন নি !

অথচ সেখান থেকে আর মাত্র এগারো মাইল দূরে ছিল এক-টন-ডিপো···প্রচুর খাদ্য···

শেষ জয়

এগারো দিন তাঁরা সেই তাঁবুতে প্রায় উপবাসের মধ্যে বেঁচে ছিলেন···এগারো দিন ধরে সমানে ব্লিজার্ড বইতে থাকে···প্রায় সমস্ত তাঁবু বরফে ঢাকা পড়ে যায়!

স্কটের ডায়েরী থেকে বোঝা যায়, উইলসন আর বোয়ার্সের মৃত্যুর পর সর্ব্বশেষে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁবুর বাইরে মৃত্যু গর্জ্জন করছে···আর্ত্তনাদ করছে ওট্স্ আর ইভানসের আত্মা···তাঁবুর ভেতর চোখের সামনে পড়ে অবশিষ্ট দুই সঙ্গীর মৃতদেহ···স্কট তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন, দেশবাসীর কাছে তাঁর অন্তিম চিঠি···হাতের লেখার মধ্যে এতটুকু দুর্ব্বলতার কাঁপুনি নেই, চিঠির ভাষার ভেতর এতটুকু নেই কাতরতা, নিজের জন্যে নেই বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা··· তখনও তিনি দলপতি···এবং দলপতির শেষ কর্ত্তব্য হিসেবেই সেই চিঠি তিনি লিখছেন···সে-মুহূর্ত্তে সজ্ঞানে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন তিনি···

তিনি লিখছেন,

* * * আঙুলে লেখবার শক্তি দ্রুত কমে আসছে...তবু আমাকে এই চিঠি শেষ করতে হবে···আমার জন্যে নয়, আমার বীর সহযাত্রীরা যেভাবে মেরুর মহানির্জ্জনতায় মানুষের চরম বীর্য্যের পরিচয় দিয়ে গেলেন, তার কাহিনী জগতের জানা দরকার···

* * আমি যে এই অভিযানে এসেছিলাম, তার জন্যে এতটুকু ক্ষোভ আমার নেই···আমার নিজের জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ করবার কিছু নেই··· আমি আনন্দিত, আমার এই অভিযানে নতুন করে আমরা প্রমাণ করে

গেলাম, ইংলণ্ড এখনো বেঁচে আছে···প্রমাণ করে গেলাম, ইংলণ্ডের লোক বাধা বিঘ্নে ভেঙ্গে পড়ে না, মৃত্যুকে সামনে দেখে সংগ্রাম ছেড়ে পালায় না, যখন নিজের অভাব প্রচণ্ড তখনো সে তার সঙ্গীকে আনন্দে সাহায্য করতে বিমুখ হয় না, মৃত্যুর মুখোমুখি তার জাতির মর্য্যাদাকে ভোলে না···বীরের মত অকম্পিত অন্তরে আজও সে প্রয়োজন হলে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে···

বিপদের পথে আমাদের পা বাড়াতে হয়েছিল···আমরা জেনেশুনেই সে বিপদের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম···অকস্মাৎ দুর্য্যোগ এসে পদে পদে আমাদের সমস্ত হিসেব গুলিয়ে দিয়েছে, আমাদের পদে পদে বিপন্ন করে তুলেছে কিন্তু তার জন্যে কোন অভিযোগ আমরা করছি না···নতমস্তকে অনিবার্য্যকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করে গিয়েছি···

শুধু একটা অন্তিম মিনতি আমি এখানে করে যাচ্ছি আমার দেশবাসীদের কাছে, ইংলণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যেই যারা এই দক্ষিণ-মেরুতে প্রাণ দিয়ে গেল, ইংলণ্ডের লোকেরা যেন তাদের পোষ্যদের না ভোলে···

যদি আমরা বেঁচে থাকতাম, মানুষের বীর্য্য, মানুষের সহনশক্তি, মানুষের চরিত্রবল সম্বন্ধে এমন কাহিনী শোনাতে পারতাম, যাতে প্রত্যেক ইংরেজের অন্তর গর্ব্বে উদ্বেল হয়ে উঠতো। তবুও আংশিক ভাবে আমার এই ডায়েরীতে আমার সহযাত্রী বীরদের যেটুকু পরিচয় আমি রেখে যেতে পারলাম, তার সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের মৃতদেহ হয়ত সেকাহিনীকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। * * *

এই চিঠি লেখবার পর, বোধহয় মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত্তে মনে পড়ে

মার কথা, স্ত্রীর কথা, জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাহিত্য-স্রষ্টা স্যার জেম্‌স্‌ ব্যারীর কথা…

প্রত্যেককেই একখানা করে চিঠি লেখেন। শেষ চিঠি সাহিত্যিক বন্ধুকে লেখেন,

"আমাব বিশ্বাস, আপনার কবি মন জেগে উঠতো সৃজনের অপার আনন্দে, যদি কোন রকমে এই মুহূর্ত্তে আপনি আসতে পারতেন আমাদের তাঁবুতে, শুনতে পেতেন মৃত্যুপথ-যাত্রীদের মুখে জীবনের অকুণ্ঠ জয়-ধ্বনি।"

মানুষের বিরাট ইতিহাসে আমরা মাঝে মাঝে এই রকম মুহূর্ত্তের দেখা পাই, যে-মুহূর্ত্তে এই মরণ-শীল মানুষই হয়ে ওঠে মরণ-জয়ী দেবতা!

আট মাস বরফের মধ্যে সেই তাঁবুতে তাঁদেব মৃতদেহ পড়ে ছিল। আট মাস পরে এক সন্ধানী দল এসে তাঁদের মৃতদেহ খুঁজে পায়…

ওট্‌স্‌ আর ইভান্‌সে্‌ব মৃতদেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি… মেরু-তুষারের তলায় তাঁদের দেহ নিশ্চিহ্নভাবে সমাহিত হয়ে যায়…

যে-তাঁবুতে স্কট আর তাঁব দুজন সঙ্গীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই-খানে একটা মণ্ডপ তৈরী করে বিবাট একটা ক্রসের চিহ্ন তোলা হয়…

আজও দক্ষিণ-মেরুর জনহীন নিজ্জনতায় সেই ক্রশ দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্য্যের স্মরণ-চিহ্ন রূপে…

যেখানে ওট স্‌ তুষারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেখানেও একটা স্মৃতি-চিহ্ন গড়ে তোলা হয়েছে, সেই স্মৃতিচিহ্নের গায়ে ওট্‌সের পরিচয় স্বরূপ শুধু লেখা আছে,

এরি কাছাকাছি কোথাও ঘুমুচ্ছেন ওট্‌স্‌…জগতের একজন সত্যি-কারের ভদ্রলোক…

এই ঘটনার কুড়ি বছর পরে ইংলণ্ডের লোকের স্কটের স্মৃতির সামনে একটা মেরু-মিউজিয়াম গড়ে তোলেন, তার দরজায় স্কটকে স্মরণ করে দু' লাইন কবিতা লেখা আছে,

He sought thc secrets of the Pole
He found the secrets of God

—তিনি গিয়েছিলেন মেরুর রহস্য আবিষ্কার করতে, পেলেন ভগবানের রহস্যের সন্ধান !

MAHARAJA BIR BIKRAM LIBRARY Agartala